শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

VIS... ...RATI
295851
L...RY

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৪২
পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৫৩, ভাদ্র ১৩৫৫
সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৬৭
সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩
সংস্করণ ভাদ্র ১৩৮৩
পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৩৯৬

© বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীপ্রাণকুমার মুখার্জি
এস. আণ্টুল অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
৯১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড। কলিকাতা ৯

প্রথম ছত্রের সূচী

বিন্দু-চিহ্নিত রচনা সংযোজন অংশে

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ	১২৬
অনেক কালের একটিমাত্র দিন	১০৩
অনেক হাজার বছরের	২৮
অন্ত কথা পরে হবে	৫৬
অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে	৫৮
আকাশে চেয়ে দেখি	৯২
আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি	৮৩
আমরা কি সত্যই চাই শোকের অবসান	৬৬
আমার এই ছোটো	১৯৩ । ২১০
আমার এই ছোটো কলসিটা পেতে রাখি	৯৬
আমার কাছে শুনতে চেয়েছ	৬৩
আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে	৮৬
আমার শেষবেলাকার ঘরখানি	১৬৩
আমি বদল করেছি আমার বাসা	৫৩
ঋষি কবি বলেছেন	১৩৮
এই-যে সবার সামান্ত পথ, পায়ে হাঁটার গলি	১৯৭
একদিন কোন্‌ তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে	১৭৭
একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে	১৩
একদিন শান্ত হলে আষাঢ়ের ধারা	১৭৯
ওরা এসে আমাকে বলে	১৩৫
কালো অন্ধকারের তলায়	৫০

কেউ চেনা নয়	৪৬
তখন আমার আয়ুর তরণী	১৬৭
তখন আমার বয়স ছিল সাত	১৭০
তখন বয়স ছিল কাঁচা	৬৯
তুমি গল্প জমাতে পার	১৪৬
তুমি প্রভাতের শুকতারা	৯৯
দিনের প্রান্তে এসেছি	২৪
দুঃখ যেন জাল পেতেছে চার দিকে	১৮৫
দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের ব্যাকুল চঞ্চলতা	১৯৫
নব বরষায় দিন	২০১
নূতন কল্পে	৭৫
পড়েছি আজ রেখার মায়ায়	৬০
পথিক আমি	১২৪
পাড়ায় আছে ক্লাব	১০৯
পঁচিশে বৈশাখ চলেছে	১৫৩
পাঁচিলের এ ধারে	৮৯
পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ	১১৫
ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন	১৫
বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে	২১
বাদশাহের হুকুম	১২০
বিশ্বলক্ষ্মী, তুমি একদিন বৈশাখে	১৩১
ভালোবেসে মন বললে	৩৬
ভোরের আলো-আঁধারে	৪২
মনটা আছে আরামে	৬২

মনে মনে দেখলুম	৩১
মনে হয়েছিল, আজ সব কটা দুর্গ্রহ	৪০
যখন দেখা হল	১০৬
যেথা দূর যৌবনের প্রান্তসীমা	১৮১
যৌবনের প্রান্তসীমায়	১৭
রাস্তায় চলতে চলতে	৪৮
শিল্পীর ছবিতে যাহা মূর্তিমতী	১৮৮
শীতের রোদ্দুর	১২৮
শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে	৮০
সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা	৭২
স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে	১১
হালকা আমার স্বভাব	১৪৩
হে যক্ষ, তোমার প্রেম ছিল বদ্ধ কোরকের মতো	২০৩
হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের	১৩৩

চিত্র

শেষ সপ্তকের প্রচ্ছদলিপি কবি স্বয়ং প্রস্তুত করেন। মৃন্ময় শ্যামলী গৃহের দেহলীতে দণ্ডায়মান কবির আলোকচিত্র হিরণকুমার সান্যালের সৌজন্যে। সংযোজন-ধৃত 'ঘটভরা' কবিতার পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে।

শেষ সপ্তক

এক

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে,
মনেও হয় নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।
তুমিও মূল্য কর নি দাবি।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় ক'রে।
আড়চোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে ;
পরদিনে মনে রইল না।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ।

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে,
'তোমাকে যা দিই
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি ;
আরো দেওয়া হল না,
আরো যে আমার নেই।'
বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছল্‌ছলিয়ে।

আজ তুমি গেছ চ'লে,
দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আস না।

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা,
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে।

শান্তিনিকেতন
১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

দুই

একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে
কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাস্যে
আমার আত্মবিহ্বল যৌবনটাকে
দিলে তুমি দোলা ;
হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে
একটি অমৃতরেখা ;
আর কোনোদিন তার দেখা মেলে নি।
জোয়ারের তরঙ্গ-লীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।

এমনি এক পলকে বুকে এসে লাগে
অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনা
প্রাণের আধ-খোলা জালনায়
দূর বনান্ত থেকে
পথ-চল্‌তি গানে।

অভূতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মীড় লাগিয়ে যায়
হৃদয়তারে
বৃষ্টিধারামুখর নির্জন প্রবাসে,
সন্ধ্যাযূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে
রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক
আপন স্খলিত উত্তরীয়ের স্পর্শ।

তার পরে মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে ;
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে,
যখন গোরু-চরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে ;
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে
সূর্যাস্তের ও পার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।

তিন

ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন ;
কৌতূহলী ভোরের আলো
কুয়াশার আবরণ দিল সরিয়ে।
হঠাৎ দেখি শিশিরে-ভেজা বাতাবিগাছে
ধরেছে কচি পাতা ;
সে যেন আপনি বিস্মিত।
একদিন তমসার কূলে বাল্মীকি
আপনার প্রথমনিশ্বসিত ছন্দে
চকিত হয়েছিলেন নিজে—
তেমনি দেখলেম ওকে।

অনেক দিনকার নিঃশব্দ অবহেলা থেকে
অরুণ আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে
এই কয়টি কিশলয় ;
সে যেন সেই একটুখানি কথা
যা তুমিই বলতে পারতে,
কিন্তু না বলে গিয়েছ চলে

সেদিন বসন্ত ছিল অনতিদূরে ;
তোমার আমার মাঝখানে ছিল
আধ-চেনার যবনিকা ;
কেঁপে উঠল সেটা মাঝে মাঝে ;
মাঝে মাঝে তার একটা কোণ গেল উড়ে ;
দুরন্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ-বাতাস,
তবু সরাতে পারে নি অন্তরাল।
উচ্ছৃঙ্খল অবকাশ ঘটল না ;
ঘণ্টা গেল বেজে,
সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে।

চার

যৌবনেব প্রান্তসীমায়
জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার ম্লান অবশেষ—
যাক কেটে এর আবেশটুকু ;
সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক
আমার ঘোর-ভাঙা চোখ,
স্মৃতিবিস্মৃতির নানা বর্ণে রঞ্জিত
দুঃখসুখের বাষ্পঘনিমা
সরে যাক সন্ধ্যামেঘের মতো
আপনাকে উপেক্ষা করে।

ঝরে-পড়া ফুলের ঘনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চার দিকে তার স্বপ্ন-মৌমাছি
গুন্ গুন্ করে বেড়ায়
কোন্ অলক্ষ্যের সৌরভে।
এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।

২

শেষ সপ্তক

অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
স্মৃষ্টির মহাসাগরে।

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব
ওই নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে
যেখানে নিমেষের অন্তরালে
সহস্র বৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল
রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়।
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।

বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস,
ফিকে রঙের নীলাম্বরের প্রান্তে
বেগ্‌নি রঙের আঁচ্‌লা।
গাংচিল উড়ে বেড়াচ্ছে
মাছধরা জালের উপরকার আকাশে।
মাছ্‌রাঙা স্তব্ধ বসে আছে বাঁশের খোঁটায়,
তার স্থির ছায়া নিস্তরঙ্গ জলে।
ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধগন্ধ।

চার দিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।
অতিপুরাতন প্রাণের বহু দিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা।

চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে ;
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদুতালের ছন্দে।

এর আলো-ছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু-মহাসাগর-সঙ্গমে ॥

পাঁচ

বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে ;
ঘনিয়েছে সার-বাঁধা তালের চূড়ায়,
রোমাঞ্চ দিয়েছে বাঁধের কালো জলে।
বর্ষা নামে হৃদয়ের দিগন্তে
যখন পারি তাকে আহ্বান করতে।

কিছুকাল ছিলেম বিদেশে।
সেখানকার শ্রাবণের ভাষা
আমার প্রাণের ভাষার সঙ্গে মেলে নি।
তার অভিষেক হল না
আমার অন্তরপ্রাঙ্গণে।

সজল মেঘ-শ্যামলের
সঞ্চরণ থেকে বঞ্চিত জীবনে
কিছু শীর্ণতা রয়ে গেল।
বনস্পতির অঙ্গের আয়তি
ওই তো দেয় বাড়িয়ে
বছরে বছরে ;
তার কাষ্ঠফলকে চক্রচিহ্নে স্বাক্ষর যায় রেখে।

তেমনি করে প্রতি বছরে বর্ষার আনন্দ
আমার মজ্জার মধ্যে রসসম্পদ
কিছু যোগ করে।
প্রতিবার রঙের প্রলেপ লাগে
জীবনের পটভূমিকায়
নিবিড়তর ক'রে ;
বছরে বছরে শিল্পকারের
অঙ্গুরি-মুদ্রার গুপ্ত সংকেত
অঙ্কিত হয় অন্তরফলকে।

নিরালায় জানালার কাছে বসেছি যখন
নিষ্কর্মা প্রহরগুলো নিঃশব্দচরণে
কিছু দান রেখে গেছে আমার দেহলিতে ;
জীবনের গুপ্ত ধনের ভাণ্ডারে
পুঞ্জিত হয়েছে বিস্মৃত মুহূর্তের সঞ্চয়।

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে।

তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে
গোচরতাকে ;
বলেছে, যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা—
বলেছে, যেমন বলে নিশান্তের অরুণ আভাস—
'এসো প্রকাশ, এসো।'

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে—
বধূ যেমন সত্য করে জানে আপনাকে,
সত্য করে জানায়,
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার করতে,
যখন দৈন্যকে দেয় সে মহিমা,
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি।

ছয়

দিনের প্রান্তে এসেছি
গোধূলির ঘাটে।
পথে পথে পাত্র ভরেছি
অনেক কিছু দিয়ে।
ভেবেছিলেম চিরপথের পাথেয় সেগুলি ;
দাম দিয়েছি কঠিন দুঃখে।
অনেক করেছি সংগ্রহ মানুষের কথার হাটে,
কিছু করেছি সঞ্চয় প্রেমের সদাব্রতে।
শেষে ভুলেছি সার্থকতার কথা,
অকারণে কুড়িয়ে বেড়ানোই হয়েছে অন্ধ অভ্যাসে বাঁধা ;
ফুটো ঝুলিটার শূন্য ভরাবার জন্যে
বিশ্রাম ছিল না।

আজ সামনে যখন দেখি
ফুরিয়ে এল পথ,
পাথেয়ের অর্থ আর রইল না কিছুই।

যে প্রদীপ জ্বলেছিল মিলনশয্যার পাশে
সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে করে।
তার শিখা নিবল আজ,
সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে।

সামনের আকাশে জ্বলবে একলা সন্ধ্যার তারা।
যে বাঁশি বাজিয়েছি
ভোরের আলোয়, নিশীথের অন্ধকারে,
তার শেষ সুরটি বেজে থামবে
রাতের শেষ প্রহরে।

তার পরে?
যে জীবনে আলো নিবল,
সুর থামল,
সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই
ভরা সত্য ছিল,
সে কথা একেবারেই ভুলবে জানি—
ভোলাই ভালো।
তবু তার আগে কোনো-এক দিনের জন্য
কেউ-একজন
সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো,
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।

আমার এতদিনকার যাওয়া-আসার পথে
শুকনো পাতা ঝরেছে,
সেখানে মিলেছে আলোক ছায়া,
বৃষ্টিধারায় আম-কাঁঠালের ডালে ডালে

জেগেছে শব্দের শিহরণ,
সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত পদে।

এই সামান্য ছবিটুকু
আর সব-কিছু থেকে বেছে নিয়ে
কেউ-একজন আপন ধ্যানের পটে এঁকো
কোনো-একটি গোধূলির ধূসর মুহূর্তে।

আর বেশি কিছু নয়।
আমি আলোর প্রেমিক;
প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি-বাজিয়ে।
পিছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া
দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে।

যে পথিক অস্তসূর্যের
ম্লায়মান আলোর পথ নিয়েছে
সে তো ধুলোর হাতে উজাড় করে দিলে
সমস্ত আপনার দাবি;
সেই ধুলোর উদাসীন বেদীটার সামনে
রেখে যেয়ো না তোমার নৈবেদ্য—

ফিরে নিয়ে যাও অন্নের থালি
যেখানে তাকিয়ে আছে ক্ষুধা,
যেখানে অতিথি বসে আছে দ্বারে,
যেখানে প্রহরে প্রহরে বাজছে ঘণ্টা
জীবনপ্রবাহের সঙ্গে কালপ্রবাহের
মিলের মাত্রা রেখে।

সাত

অনেক হাজার বছরের
মরুযবনিকার আচ্ছাদন
যখন উৎক্ষিপ্ত হল,
দেখা দিল তারিখ-হারানো লোকালয়ের
বিরাট কঙ্কাল—
ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে
ছিল তার জীবনক্ষেত্র।
তার মুখরিত শতাব্দী
আপনার সমস্ত কবিগান
বাণীহীন অতলে দিয়েছে বিসর্জন।
আর, যে-সব গান তখনো ছিল অঙ্কুরে, ছিল মুকুলে,
যে বিপুল সম্ভাব্য
সেদিন অনালোকে ছিল প্রচ্ছন্ন,
অপ্রকাশ থেকে অপ্রকাশেই গেল মগ্ন হয়ে—
যা ছিল অপ্রজ্বল ধোঁওয়ার গোপন আচ্ছাদনে
তাও নিবল।
যা বিকোলো, আর যা বিকোলো না,
দুই সংসারের হাট থেকে গেল চলে
একই মূল্যের ছাপ নিয়ে।

কোথাও রইল না তার ক্ষত,
কোথাও বাজল না তার ক্ষতি।

ওই নির্মল নিঃশব্দ আকাশে
অসংখ্য কল্প-কল্পান্তরের
হয়েছে আবর্তন।
নূতন নূতন বিশ্ব
অন্ধকারের নাড়ী ছিঁড়ে
জন্ম নিয়েছে আলোকে,
ভেসে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের ফেনপুঞ্জে,
অবশেষে যুগান্তে তারা তেমনি করেই গেছে
যেমন গেছে বর্ষণশান্ত মেঘ,
যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্গ।

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি,
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারই নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ওই সন্ন্যাসের দীক্ষা।

জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।

১৯ চৈত্র ১৩৪১

আট

মনে মনে দেখলুম
সেই দূর অতীত যুগের নিঃশব্দ সাধনা
যা মুখর ইতিহাসকে নিষিদ্ধ রেখেছে
আপন তপস্যার আসন থেকে।

দেখলেম দুর্গম গিরিব্রজে
কোলাহলী কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে
অসূর্যম্পশ্য নিভৃতে
ছবি আঁকছে গুণী
গুহাভিত্তির 'পরে
যেমন অন্ধকারপটে
সৃষ্টিকার আঁকছেন বিশ্বছবি।
সেই ছবিতে ওরা আপন আনন্দকেই করেছে সত্য,
আপন পরিচয়কে করেছে উপেক্ষা,
দাম চায় নি বাইরের দিকে হাত পেতে,
নামকে দিয়েছে মুছে।

হে অনামা, হে রূপের তাপস,
প্রণাম করি তোমাদের।

নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি
তোমাদের এই যুগান্তরের কীর্তিতে।

নামক্ষালন যে পবিত্র অন্ধকারে ডুব দিয়ে
তোমাদের সাধনাকে করেছিলে নির্মল,
সেই অন্ধকারের মহিমাকে
আমি আজ বন্দনা করি।
তোমাদের নিঃশব্দ বাণী
রয়েছে এই গুহায়,
বলছে— নামের পূজার অর্ঘ্য,
ভাবীকালের খ্যাতি,
সে তো প্রেতের অন্ন ;
ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ-করা।
তার পিছনে ছুটে
সন্থ-বর্তমানের অন্নপূর্ণার
পরিবেশন এড়িয়ে যেয়ো না, মোহান্ধ !

আজ আমার দ্বারের কাছে
শজনে গাছের পাতা গেল ঝরে,
ডালে ডালে দেখা দিয়েছে
কচি পাতার রোমাঞ্চ ;
এখন প্রৌঢ় বসন্তের পারের খেয়া

চৈত্র মাসের মধ্যস্রোতে ;
মধ্যাহ্নের তপ্ত হাওয়ায়
গাছে গাছে দোলাদুলি ;
উড়তি ধুলোয় আকাশের নীলিমাতে
ধূসরের আভাস,
নানা পাখির কলকাকলিতে
বাতাসে আঁকছে
শব্দের অস্ফুট আলপনা।

এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝল্‌মল্‌ করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্যমুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়,
কোনো বিরোধ।

যখন কোনোদিন গান করেছি রচনা,
সেও তো আপন অন্তরে
এইরকম পাতার হিল্লোল,
হাওয়ার চাঞ্চল্য,

শেষ সপ্তক

রৌদ্রের ঝলক,
প্রকাশের হর্ষ বেদনা।
সেও তো এসেছে বিনা নামের অতিথি,
গর-ঠিকানার পথিক।
তার যেটুকু সত্য
তা সেই মুহূর্তেই পূর্ণ হয়েছে,
তার বেশি আর বাড়বে না একটুও
নামের পিঠে চ'ড়ে।

বর্তমানের দিগন্ত-পারে
যে কাল আমার লক্ষ্যের অতীত
সেখানে অজানা অনাত্মীয় অসংখ্যের মাঝখানে
যখন ঠেলাঠেলি চলবে
লক্ষ লক্ষ নামে নামে,
তখন তারই সঙ্গে দৈবক্রমে চলতে থাকবে
বেদনাহীন চেতনাহীন ছায়ামাত্রসার
আমারও নামটা—
ধিক্ থাক্ সেই কাঙাল কল্পনার মরীচিকায়।
জীবনের অল্প কয়দিনে
বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ
দিক আমাকে নিরহংকার মুক্তি।

শেষ সপ্তক

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

শান্তিনিকেতন
১।৪।৩৫

নয়

ভালোবেসে মন বললে,
“আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে।”
অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অত্যুক্তি।
দিতে পারবে কেন।
সবটার নাগাল পাব কেমন করে ?
ও যে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্বাক্ অনতিক্রমণীয়।
তার মাথা উঠেছে মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়,
তার পা নেমেছে আঁধারে-ঢাকা গহ্বরে।

এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা,
বাষ্প-আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে,
দুরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।
যাকে বলতে পারি আমার সবটা,
তার নাম দেওয়া হয় নি,
তার নক্শা শেষ হবে কবে!
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার!

নামটা রয়েছে যে পরিচয়টুকু নিয়ে
টুকরো-জোড়া-দেওয়া তার রূপ,
অনাবিষ্কৃতের-প্রান্ত-থেকে-সংগ্রহ-করা।

চার দিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে;
হাওয়ায় লাগে শীত-বসন্তের ছোঁওয়া—
সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হল।
ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে।
জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে
কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়,
আর-এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা
বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে,
মরীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি।
এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল
জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে।
তার আলোকহীন প্রদেশে
বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে—

আত্মবিস্মৃত শক্তি,
মূল্য পায় নি এমন মহিমা,
অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়
সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা,
প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা,
অখ্যাত ইতিহাস ;
আছে আত্মাভিমানের
ছদ্মবেশের বহু উপকরণ ;
সেখানে নির্গূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি—
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে।
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে—
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।

অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী ;
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে ;
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে—

কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি,
তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা;
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরই হাতে,
কারও চোখের সামনে ধরবার সময় আসে নি,
সবাই রইল দূরে—
যারা বললে 'জানি' তারা জানল না।

শান্তিনিকেতন
২৭।৩।৩৫

মনে হয়েছিল, আজ সব কটা দুর্গ্রহ
চক্র করে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়।
অদৃষ্ট জাল ফেলে অন্তরের শেষ তলা থেকে
টেনে টেনে তুলছে নাড়ী-ছেঁড়া যন্ত্রণাকে।
মনে হয়েছিল, অন্তহীন এই দুঃখ;
মনে হয়েছিল, পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধায়
শেষ পর্যন্ত এমনি করে
অন্ধকার হাৎড়িয়ে বেড়ানো।
ভিত-সুদ্ধ বাসা গেছে ডুবে,
ভাগ্যের ভাঙনের অপঘাতে।

এমন সময়ে সন্তবর্তমানের
প্রাকার ডিঙিয়ে দৃষ্টি গেল
দূর অতীতের দিগন্তলীন
বাগ্‌বাদিনীর বাণীসভায়।
যুগান্তরের ভগ্নশেষের ভিত্তিচ্ছায়ায়
ছায়ামূর্তি বাজিয়ে তুলেছে রুদ্রবীণায়
পুরাণখ্যাত কালের কোন্ নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা।
দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা

সেই দারুণ কাহিনী।
কোন্ দুর্দাম সর্বনাশের
বজ্র-ঝঞ্ঝনিত মৃত্যুমাতাল দিনের
হুহুংকার,
যার আতঙ্কের কম্পনে
ঝংকৃত করছে বীণাপাণি
আপন বীণার তীব্রতম তার।

দেখতে পেলেম
কত কালের দুঃখ লজ্জা গ্লানি
কত যুগের জ্বলৎ-ধারা মর্মনিঃস্রাব
সংহত হয়েছে,
ধরেছে দহনহীন বাণীমূর্তি
অতীতের সৃষ্টিশালায়।

আর, তার বাইরে পড়ে আছে
নির্বাপিত বেদনার পর্বতপ্রমাণ ভস্মরাশি-
জ্যোতির্হীন, বাক্যহীন, অর্থশূন্য।

এগারো

ভোরের আলো-আঁধারে
থেকে থেকে উঠছে কোকিলের ডাক,
যেন ক্ষণে ক্ষণে শব্দের আতশবাজি !
ছেঁড়া মেঘ ছড়িয়েছে আকাশে
একটু একটু সোনার লিখন নিয়ে।

হাটের দিন,
মাঠের মাঝখানকার পথে
চলেছে গোরুর গাড়ি।
কলসীতে নতুন আখের গুড়, চালের বস্তা ;
গ্রামের মেয়ে কাঁখের ঝুড়িতে নিয়েছে
কচু শাক, কাঁচা আম, শজনের ডাঁটা।

ছ'টা বাজল ইস্কুলের ঘড়িতে।
ওই ঘণ্টার শব্দ আর সকালবেলাকার কাঁচা রোদ্‌দুরের রঙ
মিলে গেছে আমার মনে।
আমার ছোটো বাগানের পাঁচিলের গায়ে
বসেছি চৌকি টেনে
করবী গাছের তলায়।

শেষ সপ্তক

পুব দিক থেকে রোদ্দুরের ছটা
বাঁকা ছায়া হানছে ঘাসের 'পরে !
বাতাসে অস্থির দোলা লেগেছে
পাশাপাশি দুটি নারকেলের শাখায়।
মনে হচ্ছে, যমজ শিশুর কলরবের মতো।
কচি দাড়িম ধরেছে গাছে
চিকন সবুজের আড়ালে।

চৈত্র মাস ঠেকল এসে শেষ হপ্তায়।
আকাশে-ভাসা বসন্তের নৌকায়
পাল পড়েছে ঢিলে হয়ে।
দূর্বাঘাস উপবাসে শীর্ণ ;
কাঁকর-ঢালা পথের ধারে
বিলিতি মৌশুমি চারায়
ফুলগুলি রঙ হারিয়ে সংকুচিত।
হাওয়া দিয়েছে পশ্চিম দিক থেকে—
বিদেশী হাওয়া চৈত্র মাসের আঙিনাতে।
গায়ে দিতে হল আবরণ অনিচ্ছায়।
বাঁধানো জলকুণ্ডে জল উঠছে সির্‌সিরিয়ে,
টল্‌মল্‌ করছে নাল গাছের পাতা,
লাল মাছ ক'টা চঞ্চল হয়ে উঠল।

নেবু ঘাস ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে
খেলা-পাহাড়ের গায়ে।
তার মধ্যে থেকে দেখা যায়
গেরুয়া পাথরের চতুর্মুখ মূর্তি।
সে আছে প্রবহমান কালের দূর তীরে
উদাসীন ;
ঋতুর স্পর্শ লাগে না তার গায়ে।
শিল্পের ভাষা তার,
গাছপালার বাণীর সঙ্গে কোনো মিল নেই।
ধরণীর অন্তঃপুর থেকে যে শুশ্রূষা
দিনে রাতে সঞ্চারিত হচ্ছে
সমস্ত গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায়,
ওই মূর্তি সেই বৃহৎ আত্মীয়তার বাইরে।
মানুষ আপন গূঢ় বাক্য অনেক কাল আগে
যক্ষের মৃত ধনের মতো
ওর মধ্যে রেখেছে নিরুদ্ধ করে,
প্রকৃতির বাণীর সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধ।

সাতটা বাজল ঘড়িতে।
ছড়িয়ে-পড়া মেঘগুলি গেছে মিলিয়ে।
সূর্য উঠল প্রাচীরের উপরে,
ছোটো হয়ে গেল গাছের যত ছায়া।

খিড়কির দরজা দিয়ে
মেয়েটি ঢুকল বাগানে।
পিঠে ছুলছে ঝালরওয়ালা বেণী,
হাতে কঞ্চির ছড়ি ;
চরাতে এনেছে
একজোড়া রাজহাঁস
আর তার ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে।
হাঁস ছুটো দাম্পত্য দায়িত্বের মর্যাদায় গম্ভীর,
সকলের চেয়ে গুরুতর ওই মেয়েটির দায়িত্ব।
জীবপ্রাণের দাবি স্পন্দমান
ছোট্টো ওই মাতৃমনের স্নেহরসে।

আজকের এই সকালটুকুকে
ইচ্ছে করেছি রেখে দিতে।
ও এসেছে অনায়াসে,
অনায়াসেই যাবে চলে।
যিনি দিলেন পাঠিয়ে
তিনি আগেই এর মূল্য দিয়েছেন শোধ করে
আপন আনন্দভাণ্ডার থেকে।

বারো

কেউ চেনা নয়,
সব মানুষই অজানা।
চলেছে আপনার রহস্যে
আপনি একাকী।
সেখানে তার দোসর নেই।
সংসারের ছাপমারা কাঠামোয়
মানুষের সীমা দিই বানিয়ে।
সংজ্ঞার বেড়া-দেওয়া বসতির মধ্যে
বাঁধা মাইনেয় কাজ করে সে।
থাকে সাধারণের চিহ্ন নিয়ে ললাটে।

এমন সময় কোথা থেকে
ভালোবাসার বসন্ত-হাওয়া লাগে—
সীমার আড়ালটা যায় উড়ে,
বেরিয়ে পড়ে চির-অচেনা।
সামনে তাকে দেখি স্বয়ংস্বতন্ত্র, অপূর্ব, অসাধারণ-
তার জুড়ি কেউ নেই।
তার সঙ্গে যোগ দেবার বেলায়
বাঁধতে হয় গানের সেতু,
ফুলের ভাষায় করি তার অভ্যর্থনা।

চোখ বলে,
যা দেখলুম তুমি আছ তাকে পেরিয়ে।
মন বলে,
চোখে-দেখা কানে-শোনার ও পারে যে রহস্য
তুমি এসেছ সেই অগমের দূত—
রাত্রি যেমন আসে
পৃথিবীর সামনে নক্ষত্রলোক অবারিত ক'রে।

তখন হঠাৎ দেখি আমার মধ্যেকার অচেনাকে,
তখন আপন অনুভবের
তল খুঁজে পাই নে,
সেই অনুভব
'তিলে তিলে নূতন হোয়'।

ভেঙো

রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল, 'অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়।'
দেখে অবুঝ মন বলে,
'অধরাকে ধরেছি।'

তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে
দাঁড়িয়ে ছিলে জানলায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের
পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের
মধুরিমায়।
ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে,
ও গেল চলে;
জানলে না এই গানে তোমারই কথা।

তুমি রাগিণীর মতো আস যাও
একতারার তারে তারে।

সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,
দোলে বসন্তের বাতাসে।
তাকে বেড়াই বুকে করে ;
ওতে রঙ লাগাই, ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।
যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ যাই ভুলে ;
কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয় অদৃশ্য
অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে,
মিলিয়ে যায় দোলনচাঁপার গন্ধে।

অচিন পাখি তুমি,
মিলনের খাঁচায় থাক—
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,
স্তকিত ওড়ার মধ্যে।
তার ঠিকানা নেই,
তার অভিসার দিগন্তের পারে
সকল দৃশ্যের বিলীনতায়।

চোদ্দো

কালো অন্ধকারের তলায়
পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে।
বাতাস থম্‌থমে,
গাছের পাতা নড়ে না,
স্বচ্ছ রাত্রের তারাগুলি
যেন নেমে আসছে
পুরাতন মহানিম গাছের
ঝিল্লিঝংকৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি।

এমন সময়ে হঠাৎ আবেগে
আমার হাত ধরলে চেপে ;
বললে, "তোমাকে ভুলব না কোনোদিনই।"
দীপহীন বাতায়নে
আমার মূর্তি ছিল অস্পষ্ট,
সেই ছায়ার আবরণে
তোমার অন্তরতম আবেদনের
সংকোচ গিয়েছিল কেটে।
সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।

সেই মুহূর্তের আনন্দ বেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হল আগামী জন্ম-জন্মান্তরে।
সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।
তোমার কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে
সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধনা,
সে পেয়েছে অমৃত।
তোমার সংসারে অসংখ্য যা-কিছু আছে
তার সবচেয়ে অত্যন্ত ক'রে আছি আমি,
অত্যন্ত বেঁচে।

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
সে গৌণ।
এর বাইরে আছে মরণ—
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাব নেপথ্যে।
প্রত্যক্ষ সুখদুঃখের জগতে
মূর্তিমান অসংখ্যতার কাছে
আমার স্মরণচ্ছায়া মানবে পরাভব।
তোমার দ্বারের কাছে আছে যে কৃষ্ণচূড়া

যার তলায় দু বেলা জল দাও আপন হাতে,
সেও প্রধান হয়ে উঠে
তার ডাল-পালার বাইরে
সরিয়ে রাখবে আমাকে
বিশ্বের বিরাট অগোচরে।
তা হোক,
এও গৌণ।

পনেরো

শ্রীমতী রানী দেবী
কল্যাণীয়াসু

১

আমি বদল করেছি আমার বাসা।
দুটিমাত্র ছোটো ঘরে আমার আশ্রয়।
ছোটো ঘরই আমার মনের মতো।
তার কারণ বলি তোমাকে।

বড়ো ঘর বড়োর ভান করে মাত্র,
আসল বড়োকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে অবজ্ঞায়
আমার ছোটো ঘর বড়োর ভান করে না।
অসীমের প্রতিযোগিতার স্পর্ধা তার নেই
ধনী ঘরের মূঢ় ছেলের মতো।

আকাশের শখ ঘরে মেটাতে চাই নে;
তাকে পেতে চাই তার স্বস্থানে,
পেতে চাই বাইরে পূর্ণভাবে।

বেশ লাগছে।
দূর আমার কাছেই এসেছে।
জানলার পাশেই বসে বসে ভাবি—
দূর ব'লে যে পদার্থ সে সুন্দর।
মনে ভাবি সুন্দরের মধ্যেই দূর।
পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে।
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আলগা,
প্রতি দিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের।

মনে পড়ে একদিন মাঠ বেয়ে চলেছিলেম
পালকিতে, অপরাহ্নে;
কাহার ছিল আটজন;
তার মধ্যে একজনকে দেখলেম
যেন কালো পাথরে কাটা দেবতার মূর্তি;
আপন কর্মের অপমানকে প্রতি পদে সে চলছিল পেরিয়ে,
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে পাখি যেমন যায় উড়ে।
দেবতা তার সৌন্দর্যে তাকে দিয়েছেন সুদূরতার সম্মান।

এই দূর আকাশ সকল মানুষেরই অন্তরতম;
জানলা বন্ধ, দেখতে পাই নে।
বিষয়ীর সংসার, আসক্তি তার প্রাচীর—

যাকে চায় তাকে রুদ্ধ করে কাছের বন্ধনে।
ভুলে যায় আসক্তি নষ্ট করে প্রেমকে,
আগাছা যেমন ফসলকে মারে চেপে।

আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি।
দূরকে নিয়ে সেই আমার খেলা;
দূরকে সাজাই নানা সাজে,
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়
সকালে সন্ধ্যায়।

কিছু কাজ করি— তাতে লাভ নেই, তাতে লোভ নেই,
তাতে আমি নেই।
যে কাজে আছে দূরের ব্যাপ্তি
তাতে প্রতি মুহূর্তে আছে আমার মহাকাশ।
এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর মধুর রূপ, স্তব্ধ, নিঃশব্দ সুদূর—
জীবনের চার দিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র;
সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তার আসন, তার মুক্তি।

২

অন্য কথা পরে হবে।
গোড়াতেই ব'লে রাখি, তুমি চা পাঠিয়েছ পেয়েছি।
এত দিন খবর দিই নি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ব।
যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি।
ঘটনার ডাকপিওনগিরি করে না সে।
নিজেরই সংবাদ সে নিজে।

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়।
মনের মধ্যে ভাঙাগড়া কত, কতই জোড়াতাড়া;
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে,
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে;
এত দিন এই-সব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে।

মন তখন বাতাসে ছিল কান পেতে,
যে ভাব ধ্বনি খোঁজে তারই খোঁজে।
আজকাল আছে সে চোখ মেলে।
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, দেখবে ব'লে।

সে তাকায় আর বলে, 'দেখলেম।'

সংসারটা আকারের মহাযাত্রা।
কোন্ চির-জাগরূকের সামনে দিয়ে চলেছে;
তিনিও নীরবে বলছেন, 'দেখলেম।'

আদিযুগে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সংকেত এল,
'খোলো আবরণ।'
বাষ্পের যবনিকা গেল উঠে;
রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে;
ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, তিনি দেখলেন।
তাঁর দেখা আর তাঁর সৃষ্টি একই।
চিত্রকর তিনি।
তাঁর দেখার মহোৎসব দেশে দেশে, কালে কালে

৩

অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে
রেখার যাত্রী নিয়ে,
অন্ধকারের ভূমিকায় তাদের কেবল
আকারের নৃত্য ;
নির্বাক অসীমের বাণী
বাক্যহীন সীমার ভাষায়, অন্তহীন ইঙ্গিতে।

অমিতার আনন্দসম্পদ
ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে সুমিতা—
সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয় ;
শুধু রূপ, আলো দিয়ে গড়া।

আজ আদিসৃষ্টির প্রথম মুহূর্তের ধ্বনি
পৌঁছল আমার চিত্তে—
যে ধ্বনি অনাদিরাত্রির যবনিকা সরিয়ে দিয়ে
বলেছিল 'দেখো'।

এত কাল নিভৃতে
আপনি যা বলেছি আপনি তাই শুনেছি।

সেখান থেকে এলেম আর-এক নিভৃতে,
এখানে আপনি যা আঁকছি দেখছি তাই আপনি।
সমস্ত বিশ্ব জুড়ে দেবতার দেখবার আসন,
আমিও বসেছি তাঁরই পাদপীঠে,
রচনা করছি দেখা।

ষোলো

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কল্যাণীয়েষু

১

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
কথা ধনী ঘরের মেয়ে;
অর্থ আনে সঙ্গে ক'রে,
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।
গাছের শাখায় ফুল ফোটানো, ফল ধরানো,
সে কাজে আছে দায়িত্ব;
গাছের তলায় আলোছায়ার নাট-বসানো
সে আর-এক কাণ্ড।
সেইখানেই শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে,
প্রজাপতি উড়তে থাকে,
জোনাকি ঝিক্‌মিক্‌ করে রাতের বেলা।
বনের আসরে এরা সব রেখাবাহন
হালকা চালের দল,
কারো কাছে জবাবদিহি নেই।

কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না, তার কঠিন শাসন ;
রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে,
তর্জনী তোলে না।

কাজকর্ম পড়ে থাকে, চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলি,
ফাঁক পেলেই ছুটে যাই রূপ-ফলানোর অন্দরমহলে।
এমনি ক'রে মনের মধ্যে
অনেক দিনের যে লক্ষ্মীছাড়া লুকিয়ে আছে
তার সাহস গেছে বেড়ে।
সে আঁকছে ; ভাবছে না সংসারের ভালো মন্দ,
গ্রাহ্য করে না লোকমুখের নিন্দা প্রশংসা।

২

মনটা আছে আরামে।
আমার ছবি-আঁকা কলমের মুখে
খ্যাতির লাগাম পড়ে নি।
নামটা আমার খুশির উপরে
সর্দারি করতে আসে নি এখনো,
ছবি-আঁকার বুক জুড়ে
আগেভাগে নিজের আসনটা বিছিয়ে বসে নি ;
ঠেলা দিয়ে দিয়ে বলছে না
'নাম রক্ষা কোরো'।
অথচ ওই নামটা নিজের মোটা শরীর নিয়ে
স্বয়ং কোনো কাজই করে না।
সব কীর্তির মুখ্য ভাগটা আদায় করবার জন্যে
দেউড়িতে বসিয়ে রাখে পেয়াদা ;
হাজার মনিবের পিণ্ড-পাকানো
ফরমাশটাকে বেদী বানিয়ে স্তূপাকার করে রাখে
কাজের ঠিক সামনে।
এখনো সেই নামটা অবজ্ঞা করেই রয়েছে অনুপস্থিত
আমার তূলি আছে মুক্ত
যেমন মুক্ত আজ ঋতুরাজের লেখনী।

৭ এপ্রিল ১৯৩৫

সঙ্গীত

শ্রীমান ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু

আমার কাছে শুনতে চেয়েছ
গানের কথা ;
বলতে ভয় লাগে,
তবু কিছু বলব।

মানুষের জ্ঞান বানিয়ে নিয়েছে
আপন সার্থক ভাষা।
মানুষের বোধ অবুঝ, সে বোবা,
যেমন বোবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
সেই বিরাট বোবা
আপনাকে প্রকাশ করে ইঙ্গিতে,
ব্যাখ্যা করে না।
বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গি, আছে ছন্দ,
আছে নৃত্য আকাশে আকাশে।
অণু পরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র,
নাচছে সেই সীমায় সীমায় ;

গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।
তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ ;
সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা
ঘাসের ফুল থেকে শুরু ক'রে
আকাশের তারা পর্যন্ত।

মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না
বাহন করতে চায় কথাকে—
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা ;
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা,
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,
দেয় আপনার অর্থকে উল্‌টিয়ে,
নিয়মকে দেয় বাঁকা ক'রে।
মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে
তখন বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতোই
সুরসংঘকে বাঁধে সীমায়,
ভঙ্গি দেয় তাকে,
নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্তনে।
সেই সীমায়-বন্দী নাচন
পায় গানে-গড়া রূপ।

সেই বোবা রূপের দল মিলতে থাকে
স্বষ্টির অন্দরমহলে,
সেখানে যত রূপের নটী আছে
ছন্দ মেলায় সকলের সঙ্গে
নূপুর-বাঁধা চাঞ্চল্যের
দোলযাত্রায়।

'আমি যে জানি'
এ কথা যে মানুষ জানায়,
বাক্যে হোক, স্থুরে হোক, রেখায় হোক,
সে পণ্ডিত।
'আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,
রূপ দেখি'
এ কথা যার প্রাণ বলে
গান তারই জন্যে,
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হলেও
তার নাড়িতে বাজে স্থুর।

যদি স্থযোগ পাও
কথাটা নারদমুনিকে শুধিয়ো—
ঝগড়া বাধাবার জন্যে নয়,
তত্ত্বের পার পাবার জন্যে সংজ্ঞার অতীতে

৫

আঠারো

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
সুহৃদ্‌বরেষু

আমরা কি সত্যই চাই শোকের অবসান ?
আমাদের গর্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও
আমাদের অতি তীব্র বেদনাও
বহন করে না স্থায়ী সত্যকে—
সান্ত্বনা নেই এমন কথায় ;
এতে আঘাত লাগে আমাদের দুঃখের অহংকারে

জীবনটা আপন সকল সঞ্চয়
ছড়িয়ে রাখে কালের চলাচলের পথে ;
তার অবিরাম-ধাবিত চাকার তলায়
গুরুতর বেদনার চিহ্নও যায়
জীর্ণ হয়ে, অস্পষ্ট হয়ে।
আমাদের প্রিয়তমের মৃত্যু
একটিমাত্র দাবি করে আমাদের কাছে ;
সে বলে 'মনে রেখো'।

কিন্তু সংখ্যা নেই প্রাণের দাবির,
তার আহ্বান আসে চারি দিক থেকেই
মনের কাছে ;
সেই উপস্থিত কালের ভিড়ের মধ্যে
অতীত কালের একটিমাত্র আবেদন
কখন্ হয় অগোচর।

যদি বা তার কথাটা থাকে
তার ব্যথাটা যায় চলে।
তবু্ শোকের অভিমান
জীবনকে চায় বঞ্চিত করতে।
স্পর্ধা ক'রে প্রাণের দূতগুলিকে বলে,
'খুলব না দ্বার।'
প্রাণের ফসল-খেত বিচিত্র শস্যে উর্বর,
অভিমানী শোক তারই মাঝখানে
ঘিরে রাখতে চায় শোকের দেবত্র জমি—
সাধের মরুভূমি বানায় সেখানটাতে,
তার খাজনা দেয় না জীবনকে।
মৃত্যুর সঞ্চয়গুলি নিয়ে
কালের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ।
সেই অভিযোগে তার হার হতে থাকে দিনে দিনে
কিন্তু চায় না সে হার মানতে—

মনকে সমাধি দিতে চায়
তার নিজ-কৃত কবরে

সকল অহংকারই বন্ধন ;
কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহংকার।
ধন জন মান সকল আসক্তিতেই মোহ ;
নিবিড় মোহ আপন শোকের আসক্তিতে।

উনিশ

তখন বয়স ছিল কাঁচা ;
কত দিন মনে মনে এঁকেছি নিজের ছবি—
বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার,
জিন নেই, লাগাম নেই,
ছুটেছি ডাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে
ভর-সন্ধেবেলায় ;
ঘোড়ার খুরে উড়েছে ধুলো,
ধরণী যেন পিছু ডাকছে আঁচল দুলিয়ে।
আকাশে সন্ধ্যার প্রথম তারা,
দূরে মাঠের সীমানায় দেখা যায়
একটিমাত্র ব্যগ্র বিরহী আলো একটি কোন্ ঘরে
নিদ্রাহীন প্রতীক্ষায়।

যে ছিল ভাবীকালে
আগে হতে মনের মধ্যে
ফিরছিল তারই আবছায়া,
যেমন ভাবী আলোর আভাস আসে

ভোরের প্রথম কোকিল-ডাকা অন্ধকারে।

তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা,
আধোজানা
তাই অপরূপের রাঙা রঙটা
মনের দিগন্ত রেখেছিল রাঙিয়ে ;
আসন্ন ভালোবাসা
এনেছিল অঘটন-ঘটনার স্বপ্ন।
তখন ভালোবাসার যে কল্পরূপ ছিল মনে
তার সঙ্গে মহাকাব্যযুগের
দুঃসাহসের আনন্দ ছিল মিলিত।

এখন অনেক খবর পেয়েছি জগতের ;
মনে ঠাওরেছি,
সংসারের অনেকটাই মার্কামারা খবরের
মালখানা।
মনের রসনা থেকে
অজানার স্বাদ গেছে মরে,
অনুভবে পাই নে—
ভালোবাসায় সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব,
জানার মধ্যে অজানা,

কথার মধ্যে রূপকথা।
ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে;
সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,
যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি।

বিশ

সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা
আকাশের নীচে,
রাঙা মাটির পথের ধারে।
ঘাসের 'পরে বসেছে সবাই।
দক্ষিণের দিকে শালের গাছ সারি সারি—
দীর্ঘ, ঋজু, পুরাতন—
স্তব্ধ দাঁড়িয়ে,
শুক্ল নবমীর মায়াকে উপেক্ষা ক'রে।
দূরে কোকিলের ক্লান্ত কাকলিতে বনস্পতি উদাসীন।
ও যেন শিবের তপোবন-দ্বারের নন্দী,
দৃঢ় নির্মম ওর ইঙ্গিত।

সভার লোকেরা বললে,
'একটা কিছু শোনাও, কবি,
রাত গভীর হয়ে এল।'
খুললেম পুঁথিখানা,
যত প'ড়ে দেখি
সংকোচ লাগে মনে।
এরা এত কোমল, এত স্পর্শকাতর,
এত যত্নের ধন।

এদের কণ্ঠস্বর এত মৃদু,
এত কুণ্ঠিত।

এরা সব অন্তঃপুরিকা;
রাঙা অবগুণ্ঠন মুখের 'পরে,
তার উপরে ফুলকাটা পাড়
সোনার সুতোয়।
রাজহংসের গতি ওদের,
মাটিতে চলতে বাধা।
প্রাচীন কাব্যে এদের বলেছে ভীরু,
বলেছে বরবর্ণিনী।
বন্দিনী ওরা বহু সম্মানে।
ওদের নূপুর ঝংকৃত হয় প্রাচীর-ঘেরা ঘরে,
অনেক দামের আস্তরণে;
বাধা পায় তারা নৈপুণ্যের বন্ধনে।

এই পথের ধারের সভায়
আসতে পারে তারাই
সংসারের বাঁধন যাদের খসেছে—
খুলে ফেলেছে হাতের কাঁকন,
মুছে ফেলেছে সিঁদুর;
যারা ফিরবে না ঘরের মায়ায়,

যারা তীর্থযাত্রী ;
যাদের অসংকোচ অক্লান্ত গতি,
ধূলিধূসর গায়ের বসন,
যারা পথ খুঁজে পায় আকাশের তারা দেখে ;
কোনো দায় নেই যাদের
কারো মন জুগিয়ে চলবার ;
কত রৌদ্রতপ্ত দিনে,
কত অন্ধকার অর্ধরাত্রে
যাদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে
অজানা শৈলগুহায়,
জনহীন মাঠে,
পথহীন অরণ্যে।
কোথা থেকে আনব তাদের
নিন্দাপ্রশংসার ফাঁদে টেনে।

উঠে দাঁড়ালেম আসন ছেড়ে।
ওরা বললে, 'কোথা যাও, কবি ?'
আমি বললেম,
'যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে,
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।'

নূতন কালে

সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হল অসীম আকাশে
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে।
সব চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে
জ্যোতিষ্কপতঙ্গ দিয়েছে দেখা ;
গণনায় শেষ করা যায় না।

তারা কোন্ প্রথম প্রত্যুষের আলোকে
কোন্ গুহা থেকে উড়ে বেরোলো অসংখ্য,
পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল চক্রপথে
আকাশ থেকে আকাশে।
অব্যক্তে তারা ছিল প্রচ্ছন্ন,
ব্যক্তের মধ্যে ধেয়ে এল
মরণের ওড়া উড়তে ;
তারা জানে না কিসের জন্যে
এই মৃত্যুর দুর্দান্ত আবেগ।

কোন্ কেন্দ্রে জ্বলছে সেই মহা আলোক
যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে
হয়েছে উন্মত্তের মতো উৎসুক।
আয়ুর অবসান খুঁজছে আয়ুহীনের অচিন্ত্য রহস্যে।
একদিন আসবে কল্পসন্ধ্যা,
আলো আসবে ম্লান হয়ে,
ওড়ার বেগ হবে ক্লান্ত,
পাখা যাবে খসে,
লুপ্ত হবে ওরা
চিরদিনের অদৃশ্য আলোকে।

ধরার ভূমিকায় মানবযুগের
সীমা আঁকা হয়েছে
ছোটো মাপে
আলোক-আঁধারের পর্যায়ে,
নক্ষত্রলোকের বিরাট দৃষ্টির
অগোচরে।
সেখানকার নিমেষের পরিমাণে
এখানকার সৃষ্টি ও প্রলয়।

বড়ো সীমানার মধ্যে মধ্যে
ছোটো ছোটো কালের পরিমণ্ডল

আঁকা হচ্ছে, মোছা হচ্ছে।
বুদ্‌বুদের মতো উঠল মহেন্দজারো,
মরুবালুর সমুদ্রে নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে।
সুমেরিয়া, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর,
দেখা দিল বিপুল বলে
কালের ছোটো-বেড়া-দেওয়া
ইতিহাসের রঙ্গস্থলীতে ;
কাঁচা কালির লিখনের মতো
লুপ্ত হয়ে গেল
অস্পষ্ট কিছু চিহ্ন রেখে।

তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো ছুটেছিল পতঙ্গের মতো
অসীম দুর্লক্ষ্যের দিকে।
বীরেরা বলেছিল,
অমর করবে সেই আকাঙ্ক্ষার কীর্তিপ্রতিমা ;
তুলেছিল জয়স্তম্ভ।
কবিরা বলেছিল, অমর করবে
সেই আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে ;
রচেছিল মহাকবিতা।

সেই মুহূর্তে মহাকাশের অগণ্যযোজন পত্রপটে
লেখা হচ্ছিল

ধাবমান আলোকের জলদক্ষরে
সুদূর নক্ষত্রের
হোমহুতাগ্নির মন্ত্রবাণী।
সেই বাণীর একটি একটি ধ্বনির
উচ্চারণ-কালের মধ্যে
ভেঙে পড়েছে যুগের জয়স্তম্ভ,
নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য,
বিলীন হয়েছে আত্মগৌরবে-স্পর্ধিত জাতির ইতিহাস।

আজ রাত্রে আমি সেই নক্ষত্রলোকের
নিমেষহীন আলোর নীচে
আমার লতাবিতানে বসে
নমস্কার করি মহাকালকে।
অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টি-গত
খেলার সামগ্রীর মতো,
ধুলায় প'ড়ে বাতাসে যাক উড়ে।
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে—
তার সীমা কে বিচার করবে?
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের

নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে
ধরে না ;
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার ক'রে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।

বাইশ

শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে
ওই একটা অনেক কালের বুড়ো,
আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে।
আজ আমি ওকে জানাচ্ছি—
পৃথক হব আমরা।

ও এসেছে কত লক্ষ পূর্বপুরুষের
রক্তের প্রবাহ বেয়ে ;
কত যুগের ক্ষুধা ওর, কত তৃষ্ণা ;
সে-সব বেদনা বহু দিনরাত্রিকে মথিত করেছে
সুদীর্ঘধারাবাহী অতীতকালে ;
তাই নিয়ে ও অধিকার করে বসল
নবজাত প্রাণের এই বাহনকে—
ওই প্রাচীন, ওই কাঙাল।

আকাশবাণী আসে ঊর্ধ্বলোক হতে,
ওর কোলাহলে সে যায় আবিল হয়ে।
নৈবেদ্য সাজাই পূজার থালায়,
ও হাত বাড়িয়ে নেয় নিজে।

জীর্ণ করে ওকে দিনে দিনে, পলে পলে,
বাসনার দহনে ;
ওর জরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে আমাকে
যে আমি জরাহীন।
মুহূর্তে মুহূর্তে ও জিতে নিয়েছে আমার মমতা,
তাই ওকে যখন মরণে ধরে
ভয় লাগে আমার
যে আমি মৃত্যুহীন।

আমি আজ পৃথক হব।
ও থাক্ ওইখানে দ্বারের বাইরে—
ওই বৃদ্ধ, ওই বুভুক্ষু।
ও ভিক্ষা করুক, ভোগ করুক,
তালি দিক ব'সে ব'সে
ওর ছেঁড়া চাদরখানাতে ;
জন্মমরণের মাঝখানটাতে
যে আল-বাঁধা খেতটুকু আছে
সেইখানে করুক উঞ্ছবৃত্তি।

আমি দেখব ওকে জানলায় ব'সে
ওই দূরপথের পথিককে,
দীর্ঘকাল ধরে যে এসেছে

বহু দেহমনের নানা পথের বাঁকে বাঁকে
মৃত্যুর নানা খেয়া পার হয়ে।
উপরের তলায় ব'সে দেখব ওকে
ওর নানা খেয়ালের আবেশে,
আশানৈরাশ্যের ওঠাপড়ায়, সুখদুঃখের আলো-আঁধারে।
দেখব যেমন ক'রে পুতুলনাচ দেখে;
হাসব মনে মনে।
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি—
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।

তেইশ

আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি,
মনে হয়; এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে,
প্রতি দিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে।

কল্পনা করছি—
অনাগত যুগ থেকে
তীর্থযাত্রী আমি
ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।
উজান স্বপ্নের স্রোতে
পৌঁছলেম এই মুহূর্তেই
বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে।
কেবলই তাকিয়ে আছি উৎসুক চোখে।
আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে—
অন্য যুগের অজানা আমি
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে।
তাই তাকে নিয়ে এত গভীর কৌতূহল।
যার দিকে তাকাই

চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।

আমার নগ্ন চিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর,
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খসে।
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে।
দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায়।
যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাষা পায় নি
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত
আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন—
ভোর-হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে
প্রথম চঞ্চল বাণী জাগল যেন!

আমার এত কালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ

বুঝি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

চব্বিশ

আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে
বাঁধব না আজ তোড়ায়,
রঙবেরঙের সুতোগুলো থাক্,
থাক্ পড়ে ওই জরির ঝালর।

শুনে ঘরের লোকে বলে,
'যদি না বাঁধো জড়িয়ে জড়িয়ে
ওদের ধরব কী করে,
ফুলদানিতে সাজাব কোন্ উপায়ে।'

আমি বলি,
'আজকে ওরা ছুটি-পাওয়া নটী,
ওদের উচ্চহাসি অসংযত,
ওদের এলোমেলো হেলাদোলা
বকুলবনে অপরাহ্নে,
চৈত্রমাসের পড়ন্ত রৌদ্রে।
আজ দেখো ওদের যেমন-তেমন খেলা,
শোনো ওদের যখন-তখন কলধ্বনি—
তাই নিয়ে খুশি থাকো।'

বন্ধু বললে,
'এলেম তোমার ঘরে
ভরা পেয়ালার তৃষ্ণা নিয়ে।
তুমি খেপার মতো বললে,
আজকের মতো ভেঙে ফেলেছি
ছন্দের সেই পুরোনো পেয়ালাখানা।
আতিথ্যের ত্রুটি ঘটাও কেন?'

আমি বলি, 'চলো-না ঝরনা-তলায়,
ধারা সেখানে ছুটছে আপন খেয়ালে,
কোথাও মোটা কোথাও সরু।
কোথাও পড়ছে শিখর থেকে শিখরে,
কোথাও লুকোলো গুহার মধ্যে।
তার মাঝে মাঝে মোটা পাথর
পথ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বর্বরের মতো,
মাঝে মাঝে গাছের শিকড়
কাঙালের মতো ছড়িয়েছে আঙুলগুলো—
কাকে ধরতে চায় ওই জলের ঝিকিমিকির মধ্যে?'

সভার লোকে বললে,
'এ যে তোমার আবাঁধা বেণীর বাণী,
বন্দিনী সে গেল কোথায়?'

আমি বলি, 'তাকে তুমি পারবে না আজ চিনতে,
তার সাতনলী হারে আজ ঝলক নেই,
চমক দিচ্ছে না চুনি-বসানো কঙ্কণে।'
ওরা বললে, 'তবে মিছে কেন ?
কী পাব ওর কাছ থেকে ?'

আমি বলি, 'যা পাওয়া যায় গাছের ফুলে
ডালে পালায় সব মিলিয়ে।
পাতার ভিতর থেকে
তার রঙ দেখা যায় এখানে সেখানে,
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ার ঝাপ্‌টায়।
চার দিকের খোলা বাতাসে
দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।
মুঠোয় করে ধরবার জন্যে সে নয়,
তার অসাজানো আটপহুরে পরিচয়কে
অনাসক্ত হয়ে মানবার জন্যে
তার আপন স্থানে।'

পঁচিশ

পাঁচিলের এ ধারে
ফুলকাটা চীনের টবে
সাজানো গাছ সুসংযত।
ফুলের কেয়ারিতে
কাঁচি-ছাঁটা বেগ্‌নি গাছের পাড়।
পাঁচিলের গায়ে গায়ে
বন্দী-করা লতা
এরা সব হাসে মধুর ক'রে,
উচ্চহাস্য নেই এখানে ;
হাওয়ায় করে দোলাদুলি,
কিন্তু জায়গা নেই দুরন্ত নাচের—
এরা আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা।
বাগানটাকে দেখে মনে হয়
মোগল বাদশার জেনেনা,
রাজ-আদরে অলংকৃত,
কিন্তু পাহারা চার দিকে,
চরের দৃষ্টি আছে ব্যবহারের প্রতি

পাঁচিলের ও পারে দেখা যায়
একটি সুদীর্ঘ য়ুকলিপ্‌টাস
খাড়া উঠেছে ঊর্ধ্বে।
পাশেই দুটি-তিনটি সোনাঝুরি
প্রচুর পল্লবে প্রগল্‌ভ।
নীল আকাশ অবারিত বিস্তীর্ণ
ওদের মাথার উপরে।

অনেকদিন দেখেছি অন্যমনে,
আজ হঠাৎ চোখে পড়ল
ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা—
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা
আপন মুক্তিতে।
ওরা ব্রাত্য, আচারমুক্ত,
ওরা সহজ ;
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে,
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি
ওদের আছে শাখার দোলন
দীর্ঘ লয়ে ;
পল্লবগুচ্ছ নানা খেয়ালের ;
মর্মরধ্বনি হাওয়ায় ছড়ানো।

আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত ;
বললেম, 'টবের কবিতাকে
রোপণ করব মাটিতে,
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়া-ভাঙা ছন্দের অরণ্যে ।'

ছাব্বিশ

আকাশে চেয়ে দেখি
অবকাশের অন্ত নেই কোথাও।
দেশকালের সেই সুবিপুল আনুকূল্যে
তারায় তারায় নিঃশব্দ আলাপ,
তাদের দ্রুতবিচ্ছুরিত আলোকসংকেতে
তপস্বিনী নীরবতার ধ্যান কম্পমান।

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত;
চার দিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল;
অসীমের অবকাশকে খণ্ড খণ্ড ক'রে
ভিড় করেছে তারা
উৎকণ্ঠ কোলাহলে।

সংকীর্ণ জীবনে আমার স্বর তাই বিজড়িত,
সত্য পৌঁছয় না অনুজ্জ্বল বাণীতে।
প্রতি দিনের অভ্যস্ত কথার
মূল্য হল দীন,
অর্থ গেল মুছে।

আমার ভাষা যেন
কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত
হেমন্তের বেলা,
তার সুর পড়েছে চাপা।
সুস্পষ্ট প্রভাতের মতো
মন অনায়াসে মাথা তুলে বলতে পারে না—
'ভালোবাসি'।
সংকোচ লাগে কণ্ঠের কৃপণতায়।

তাই ওগো বনস্পতি,
তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী।
দেখি চেয়ে, তোমার পল্লবস্তবক
অনায়াসে পার হয়েছে
শাখাব্যূহের জটিলতা,
জয় করে নিয়েছে চার দিকে নিস্তব্ধ অবকাশ।
তোমার নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস সেই উদার পথে
উত্তীর্ণ হয়ে যায়
সূর্যোদয়মহিমার মাঝে।
সেই পথ দিয়ে দক্ষিণবাতাসের স্রোতে
অনাদি প্রাণের মন্ত্র—

তোমার নব কিশলয়ের মর্মে এসে মেলে
বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দমন্ত্র
'ভালোবাসি'।

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায়
সুদূরে ;
বর্তমান মুহূর্তগুলিকে
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন্ লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে—
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।
ঊর্ধ্বলোক থেকে কানে আসে
সৃষ্টির শাশ্বতবাণী—
'ভালোবাসি'।

যেদিন যুগান্তরের রাত্রি হল অবসান
আলোকের রশ্মিদূত
বিকীর্ণ করেছিল এই আদিমবাণী
আকাশে আকাশে।
সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে

শেষ সপ্তক

প্রাণসমুদ্রের মহাপ্লাবনে
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মন্ত্রবচন।

এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহগগনে
অস্তসাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে।

আজ দিনান্তের অন্ধকারে
এ জন্মের যত ভাবনা, যত বেদনা,
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো
জীবনের শেষবাণীতে হোক উদ্ভাসিত-
'ভালোবাসি'।

সাতাশ

আমার এই ছোটো কলসিটা পেতে রাখি
ঝরনাধারার নীচে।

বসে থাকি
কোমরে আঁচল বেঁধে,
সারা সকালবেলা,
শেওলা-ঢাকা পিছল পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।

এক নিমেষেই ঘট যায় ভরে ;
তার পরে কেবলই তার কানা ছাপিয়ে ওঠে,
জল পড়তে থাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে
বিনা কাজে, বিনা ত্বরায়—
ওই যে সূর্যের আলোয়
উপচে-পড়া জলের চলে ছুটির খেলা,
আমার খেলা ওই সঙ্গেই ছল্‌কে ওঠে
মনের ভিতর থেকে।

সবুজ বনের মিনে-করা
উপত্যকার নীল আকাশের পেয়ালা,
তারই পাহাড়-ঘেরা কানা ছাপিয়ে
পড়ছে ঝর্‌ঝরানির শব্দ।
ভোরের ঘুমে তার ডাক শুনতে পায়
গাঁয়ের মেয়েরা।

জলের ধ্বনি
বেগ্‌নি রঙের বনের সীমানা যায় পেরিয়ে,
নেমে যায় যেখানে ওই বুনোপাড়ার মানুষ
হাট করতে আসে,
তরাই গ্রামের রাস্তা ছেড়ে
বাঁকে বাঁকে উঠতে থাকে চড়াই পথ বেয়ে,
তার বলদের গলায়
রুনুঝুনু ঘণ্টা বাজে,
তার বলদের পিঠে
শুকনো কাঠের আঁঠি বোঝাই-করা।

এমনি ক'রে
প্রথম প্রহর গেল কেটে।
রাঙা ছিল সকালবেলাকার
নতুন রৌদ্রের রঙ,

উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে চলেছে পাহাড় পেরিয়ে
জলার দিকে,
শঙ্খচিল উড়ছে একলা
ঘন নীলের মধ্যে,
ঊর্ধ্বমুখ পর্বতের উধাও চিত্তে
নিঃশব্দ জপমন্ত্রের মতো।

বেলা হল,
ডাক পড়ল ঘরে।
ওরা রাগ ক'রে বললে,
'দেরি করলি কেন?'
চুপ করে থাকি নিরুত্তরে।

ঘট ভরতে দেরি হয় না
সে তো সবাই জানে;
বিনা কাজে উপচে-পড়া সময় খোওয়ানো,
তার খাপছাড়া কথা ওদের বোঝাবে কে?

আটাশ

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পাল্‌টিয়ে দিয়ে
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে,
এই কথা বলে জ্যোতিষী।
সূর্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে
রক্ত অবগুণ্ঠনের নীচে
শুভদৃষ্টির প্রদীপ তোমার জ্বাল
সাহানার সুরে।
সকালবেলায় বিরহের আকাশে
শূন্য বাসরঘরের খোলা দ্বারে
ভৈরবীর তানে লাগাও
বৈরাগ্যের মূর্ছনা।
সুপ্তিসমুদ্রের এ পারে ও পারে
চিরজীবন
সুখদুঃখের আলোয় অন্ধকারে
মনের মধ্যে দিয়েছ
আলোকবিন্দুর স্বাক্ষর
যখন নিভৃত পুলকে রোমাঞ্চ লেগেছে মনে
গোপনে রেখেছ তার 'পরে

সুরলোকের সম্মতি,
ইন্দ্রাণীর মালার একটি পাপড়ি—
তোমাকে এমনি করেই জেনেছি
আমাদের সকালসন্ধ্যার সোহাগিনী।

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ;
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান
তুমি মহিমান্বিত;
সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে।

যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
তোমার নিগূঢ় জগদ্‌ব্যাপার
সেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর,
সেখানে লক্ষকোটি বৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত।
আজ আসন্ন রজনীর প্রান্তে
কবিচিত্তে যখন জাগিয়ে তুলেছ
নিঃশব্দ শান্তিবাণী

সেই মুহূর্তেই
আমাদের অজ্ঞাত ঋতুপর্যায়ের আবর্তন
তোমার জলে স্থলে বাষ্পমণ্ডলীতে
রচনা করছে সৃষ্টিবৈচিত্র্য ।
তোমার সেই একেশ্বর যজ্ঞে
আমাদের নিমন্ত্রণ নেই,
আমাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ ।

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে কথা মানবই,
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে ।
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য,
যেখানে তুমি আমাদেরই
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা—
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর—
যেখানে আমাদের
হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি—
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানবপথিককে
নিঃশব্দে সংকেত করেছ

জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।

উনত্রিশ

অনেক কালের একটিমাত্র দিন
কেমন করে বাঁধা পড়েছিল
একটা কোনো ছন্দে, কোনো গানে,
কোনো ছবিতে।
কালের দূত তাকে সরিয়ে রেখেছিল
চলাচলের পথের বাইরে।
যুগের ভাসান-খেলায়
অনেক কিছু চলে গেল ঘাট পেরিয়ে,
সে কখন ঠেকে গিয়েছিল বাঁকের মুখে
কেউ জানতে পারে নি।

মাঘের বনে
আমের কত বোল ধরল,
কত পড়ল ঝরে;
ফাল্গুনে ফুটল পলাশ,
গাছতলার মাটি দিল ছেয়ে;
চৈত্রের রৌদ্রে আর সর্ষের খেতে
কবির লড়াই লাগল যেন
মাঠে আর আকাশে।

আমার সেই আটকে-পড়া দিনটির গায়ে
কোনো ঋতুর কোনো তূলির
চিহ্ন লাগে নি।

একদা ছিলেম ওই দিনের মাঝখানেই।
দিনটা ছিল গা ছড়িয়ে
নানা-কিছুর মধ্যে;
তারা সমস্তই ঘেঁষে ছিল আশে পাশে সামনে
তাদের দেখে গেছি সবটাই,
কিন্তু চোখে পড়ে নি সমস্তটা।
ভালো বেসেছি,
ভালো করে জানি নি
কতখানি বেসেছি।
অনেক গেছে ফেলাছড়া;
আনমনার রসের পেয়ালায়
বাকি ছিল কত।

সেদিনের যে পরিচয় ছিল আমার মনে
আজ দেখি তার চেহারা অন্য ছাঁদের।
কত এলোমেলো, কত যেমন-তেমন
সব গেছে মিলিয়ে।
তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েছে যে

তাকে আজ দূরের পটে দেখছি যেন
সেদিনকার সে নববধূ।
তনু তার দেহলতা,
ধূপছায়া রঙের আঁচলটি
মাথায় উঠেছে খোঁপাটুকু ছাড়িয়ে।
ঠিকমতো সময়টি পাই নি
তাকে সব কথা বলবার,
অনেক কথা বলা হয়েছে যখন-তখন,
সে-সব বৃথা কথা।
হতে হতে বেলা গেছে চলে।

আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্তি—
স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে ;
মনে হচ্ছে কী একটা কথা বলবে,
বলা হল না :
ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে,
ফেরার পথ নেই।

ত্রিশ

যখন দেখা হল
তার সঙ্গে চোখে চোখে
তখন আমার প্রথম বয়েস ;
সে আমাকে শুধালো—
'তুমি খুঁজে বেড়াও কাকে ?'

আমি বললেম,
'বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটা থেকে
একটা পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন্ কৌতুকে,
ভাসিয়ে দিলেন
পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে—
যেখানে ভেসে বেড়ায়
ফুলের থেকে গন্ধ,
বাঁশির থেকে ধ্বনি।
ফিরছে সে মিলের পদটি পাবে ব'লে ;
তার মৌমাছির পাখায় বাজে
খুঁজে বেড়াবার নীরব গুঞ্জরণ।'

শুনে সে রইল চুপ করে
অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।

আমার মনে লাগল ব্যথা ;
বললেম, 'কী ভাবছ তুমি ?'

ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বললে,
'কেমন করে জানবে তাকে পেলে কি না,
তোমার সেই অসংখ্যের মধ্যে
একটিমাত্রকে ?'

আমি বললেম,
'আমি যে খুঁজে বেড়াই
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের
সব চেয়ে গোপন কথা ;
ও কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে
যার আপন বেদনায়,
আমি জানি
আমার গোপন মিল আছে তারই ভিতর।'

কোনো কথা সে বলল না।
কচি শ্যামল তার রঙটি ;
গলায় সরু সোনার হারগাছি,
শরতের মেঘে লেগেছে
ক্ষীণ রোদের রেখা !

চোখে ছিল
একটা দিশাহারা ভয়ের চমক,
পাছে কেউ পালায় তাকে না বলে।
তার দুটি পায়ে ছিল দ্বিধা,
ঠাহর পায় নি
কোন্‌খানে
সীমা তার আঙিনাতে।

দেখা হল।
সংসারে আনাগোনার পথের পাশে
আমার প্রতীক্ষা ছিল
শুধ্‌ ওইটুকু নিয়ে।

তার পরে সে চলে গেছে।

একত্রিশ

পাড়ায় আছে ক্লাব,
আমার একতলার ঘরখানা
দিয়েছি ওদের ছেড়ে।
কাগজে পেয়েছি প্রশংসাবাদ,
ওরা মিটিং ক'রে আমাকে পরিয়েছে মালা।

আজ আট বছর থেকে
শূন্য আমার ঘর।
আপিস থেকে ফিরে এসে দেখি—
সেই ঘরের একটা ভাগে
টেবিলে পা তুলে
কেউ পড়ছে খবরের কাগজ,
কেউ খেলছে তাস,
কেউ করছে তুমুল তর্ক।
তামাকের ধোঁয়ায়
ঘনিয়ে ওঠে বদ্ধ হাওয়া;
ছাইদানিতে জমতে থাকে
ছাই, দেশালাইকাঠি,
পোড়া সিগারেটের টুকরো।

এই প্রচুরপরিমাণ ঘোলা আলাপের
গোলমাল দিয়ে
দিনের পর দিন
আমার সন্ধ্যার শূন্যতা দিই ভরে।
আবার রাত্তির দশটার পরে
খালি হয়ে যায়
উপুড়-করা একটা উচ্ছিষ্ট অবকাশ।
বাইরে থেকে আসে ট্র্যামের শব্দ।
কোনোদিন আপন-মনে শুনি
গ্রামোফোনের গান,
যে কয়টা রেকর্ড আছে
ঘুরে ফিরে তারই আবৃত্তি

আজ ওরা কেউ আসে নি;
গেছে হাবড়া স্টেশনে
অভ্যর্থনায়—
কে সদ্য এনেছে
সমুদ্রপারের হাততালি
আপন নামটার সঙ্গে বেঁধে।

নিবিয়ে দিয়েছি বাতি।

যাকে বলে 'আজকাল'
অনেকদিন পরে
সেই আজকালটা, সেই প্রতিদিনের নকিব
আজ নেই সন্ধ্যায় আমার ঘরে।
আট বছর আগে
এখানে ছিল হাওয়ায়-ছড়ানো যে স্পর্শ,
চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,
তারই একটা বেদনা লাগল
ঘরের সব-কিছুতেই।
যেন কী শুনব ব'লে
রইল কান পাতা;
সেই ফুলকাটা-ঢাকা-ওয়ালা
পুরোনো খালি চৌকিটা
যেন পেয়েছে কার খবর।

পিতামহের আমলের
পুরোনো মুচুকুন্দ গাছ
দাঁড়িয়ে আছে জানলার সামনে
কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারে।
রাস্তার ও পারের বাড়ি
আর এই গাছের মধ্যে যেটুকু আকাশ আছে
সেখানে দেখা যায়

জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে একটি তারা।
তাকিয়ে রইলেম তার দিকে চেয়ে,
টন্‌টন্‌ করে বুকের ভিতরটা।
যুগল জীবনের জোয়ার-জলে
কত সন্ধ্যায় দুলেছে ওই তারার ছায়া।

অনেক কথার মধ্যে
মনে পড়ছে ছোট্টো একটি কথা।
সেদিন সকালে
কাগজ পড়া হয় নি কাজের ভিড়ে।
সন্ধেবেলায় সেটা নিয়ে
বসেছি এই ঘরেতেই,
এই জানলার পাশে,
এই কেদারায়।
চুপি চুপি সে এল পিছনে,
কাগজখানা দ্রুত কেড়ে নিল হাত থেকে।
চলল কাড়াকাড়ি
উচ্চ হাসির কলরোলে।
উদ্ধার করলুম লুঠের জিনিস,
স্পর্ধা ক'রে আবার বসলুম পড়তে।
হঠাৎ সে নিবিয়ে দিল আলো।

আমার সেদিনকার
সেই হার-মানা অন্ধকার
আজ আমাকে সর্বাঙ্গে ধরেছে ঘিরে,
যেমন ক'রে সে আমাকে ঘিরেছিল
ছুয়ো-দেওয়া নীরব হাসিতে ভরা
বিজয়ী তার দুই বাহু দিয়ে
সেদিনকার সেই আলো-নেবা নির্জনে।

হঠাৎ ঝর্‌ঝরিয়ে উঠল হাওয়া
গাছের ডালে ডালে,
জানলাটা উঠল শব্দ ক'রে,
দরজার কাছের পর্দাটা
উড়ে বেড়াতে লাগল অস্থির হয়ে।

আমি বলে উঠলেম,
'ওগো, আজ তোমার ঘরে তুমি এসেছ কি
মরণলোক থেকে
তোমার বাদামি রঙের শাড়িখানি প'রে?'
একটা নিশ্বাস লাগল আমার গায়ে;
শুনলেম অশ্রুত বাণী,
'কার কাছে আসব?'
আমি বললেম, 'দেখতে কি পেলে না আমাকে?'

শুনলেম,
    'পৃথিবীতে এসে
        যাকে জেনেছিলেম একান্তই,
সেই আমার চিরকিশোর বঁধু
    তাকে তো আর পাই নে দেখতে
        এই ঘরে।'
    শুধালেম, 'সে কি নেই কোথাও?'
        মৃদু শান্ত সুরে বললে,
            'সে আছে সেইখানেই
                যেখানে আছি আমি।
                    আর কোথাও না।'

দরজার কাছে শুনলেম উত্তেজিত কলরব,
    হাবড়া স্টেশন থেকে
        ওরা ফিরেছে।

বত্রিশ

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ,
খড়কে দিয়ে উসকে দিচ্ছে থেকে থেকে।
হাতির দাঁতের মতো কোমল সাদা
পঙ্খের-কাজ-করা মেজে ;
তার উপরে খান দুয়েক মাদুর পাতা।
ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছি ঘরের কোণে
মিট্‌মিটে আলোয়।
বুড়ো মোহনসর্দার—
কলপ-লাগানো চুল বাবরি-করা,
মিশ কালো রঙ,
চোখদুটো যেন বেরিয়ে আসছে,
শিথিল হয়েছে মাংস,
হাতের পায়ের হাড়গুলো দীর্ঘ,
কণ্ঠস্বর সরু-মোটায় ভাঙা।
রোমাঞ্চ লাগবার মতো তার পূর্ব ইতিহাস।
বসেছে আমাদের মাঝখানে,
বলছে রোঘো ডাকাতের কথা।
আমরা সবাই গল্প আঁকড়ে বসে আছি।
দক্ষিণের-হাওয়া-লাগা ঝাউডালের মতো
দুলছে মনের ভিতরটা।

খোলা জানলার সামনে দেখা যায় গলি,
একটা হলদে গ্যাসের আলোর খুঁটি
দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো।
পথের বাঁ ধারটাতে জমেছে ছায়া।
গলির মোড়ে সদর রাস্তায়
বেলফুলের মালা হেঁকে গেল মালী।
পাশের বাড়ি থেকে
কুকুর ডেকে উঠল অকারণে।
ন'টার ঘণ্টা বাজল দেউড়িতে।

অবাক হয়ে শুনছি রোঘোর চরিতকথা।

তত্ত্বরত্নের ছেলের পইতে,
রোঘো ব'লে পাঠালো চরের মুখে,
'নমো-নমো করে সারলে চলবে না ঠাকুর,
ভেবো না খরচের কথা।'
মোড়লের কাছে পত্র দেয়
পাঁচ হাজার টাকা দাবি ক'রে ব্রাহ্মণের জন্যে।
রাজার খাজনা-বাকির দায়ে
বিধবার বাড়ি যায় বিকিয়ে,
হঠাৎ দেওয়ানজির ঘরে হানা দিয়ে
দেনা শোধ করে দেয় রঘু।

বলে, 'অনেক গরিবকে দিয়েছ ফাঁকি,
কিছু হালকা হোক তার বোঝা।'

একদিন তখন মাঝরাত্তির,
ফিরছে রোঘো লুঠের মাল নিয়ে,
নদীতে তার ছিপের নৌকো
অন্ধকারে বটের ছায়ায়।
পথের মধ্যে শোনে—
পাড়ায় বিয়েবাড়িতে কান্নার ধ্বনি,
বর ফিরে চলেছে বচসা ক'রে;
কনের বাপ পা আঁকড়ে ধরেছে বরকর্তার।
এমন সময়ে পথের ধারে
ঘন বাঁশবনের ভিতর থেকে
হাঁক উঠল, রে রে রে রে রে রে!
আকাশের তারাগুলো
যেন উঠল থর্‌থরিয়ে।
সবাই জানে রোঘো ডাকাতের
পাঁজর-ফাটানো ডাক।
বরসুদ্ধ পালকি পড়ল পথের মধ্যে;
বেহারা পালাবে কোথায় পায় না ভেবে।
ছুটে বেরিয়ে এল মেয়ের মা,
অন্ধকারের মধ্যে উঠল তার কান্না—

'দোহাই বাবা, আমার মেয়ের জাত বাঁচাও।'
রোঘো দাঁড়াল যমদূতের মতো—
পালকি থেকে টেনে বের করলে বরকে,
বরকর্তার গালে মারল একটা প্রচণ্ড চড়,
পড়ল সে মাথা ঘুরে।

ঘরের প্রাঙ্গণে আবার শাঁখ উঠল বেজে,
জাগল হুলুধ্বনি ;
দলবল নিয়ে রোঘো দাঁড়াল সভায়,
শিবের বিয়ের রাতে ভূত-প্রেতের দল যেন।
উলঙ্গপ্রায় দেহ সবার, তেল-মাখা সর্বাঙ্গ,
মুখে ভুসোর কালি।
বিয়ে হল সারা।
তিন পহর রাতে
যাবার সময় কনেকে বললে ডাকাত,
'তুমি আমার মা,
দুঃখ যদি পাও কখনো
স্মরণ কোরো রঘুকে।'

তার পরে এসেছে যুগান্তর।
বিদ্যুতের প্রখর আলোতে

ছেলেরা আজ খবরের কাগজে
পড়ে ডাকাতির খবর।
রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে-যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

তেত্রিশ

বাদশাহের হুকুম—
সৈন্যদল নিয়ে এল আফ্রাসায়েব খাঁ, মুজফ্‌ফর খাঁ,
মহম্মদ আমিন খাঁ,
সঙ্গে এল রাজা গোপাল সিং ভদৌরিয়া,
উদইৎ সিং বুন্দেলা।

গুরুদাসপুর ঘেরাই করল মোগল সেনা।
শিখদল আছে কেল্লার মধ্যে,
বন্দা সিং তাদের সর্দার।
ভিতরে আসে না রসদ,
বাইরে যাবার পথ সব বন্ধ।
থেকে থেকে কামানের গোলা পড়ছে
প্রাকার ডিঙিয়ে,
চার দিকের দিক্‌সীমা পর্যন্ত
রাত্রির আকাশ মশালের আলোয় রক্তবর্ণ।

ভাণ্ডারে না রইল গম, না রইল যব,
না রইল জোয়ারি;
জ্বালানি কাঠ গেছে ফুরিয়ে।

কাঁচা মাংস খায় ওরা অসহ্য ক্ষুধায়,
কেউ বা খায় নিজের জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে
গাছের ছাল, গাছের ডাল গুঁড়ো ক'রে
তাই দিয়ে বানায় রুটি।

নরক-যন্ত্রণায় কাটল আট মাস,
মোগলের হাতে পড়ল
গুরুদাসপুর গড়।
মৃত্যুর আসর রক্তে হল আকণ্ঠ পঙ্কিল,
বন্দীরা চিৎকার করে
'ওয়াহি গুরু ওয়াহি গুরু',
আর শিখের মাথা স্খলিত হয়ে পড়ে
দিনের পর দিন।

নেহাল সিং বালক;
স্বচ্ছ তরুণ সৌম্য মুখে
অন্তরের দীপ্তি পড়েছে ফুটে।
চোখে যেন স্তব্ধ আছে
সকালবেলার তীর্থযাত্রীর গান।
সুকুমার উজ্জ্বল দেহ,
দেবশিল্পী কুঁদে বের করেছে
বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে।

বয়স তার আঠারো কি উনিশ হবে—
শালগাছের চারা,
উঠেছে ঋজু হয়ে,
তবু এখনো
হেলতে পারে দক্ষিণের হাওয়ায়।
প্রাণের অজস্রতা
দেহে মনে রয়েছে
কানায় কানায় ভরা।

বেঁধে আনলে তাকে।
সভার সমস্ত চোখ
ওর মুখে তাকাল বিস্ময়ে, করুণায়।
ক্ষণেকের জন্যে
ঘাতকের খড়্গ যেন চায় বিমুখ হতে।
এমন সময় রাজধানী থেকে এল দূত,
হাতে সৈয়দ আবদুল্লা খাঁয়ের
স্বাক্ষর-করা মুক্তিপত্র।

যখন খুলে দিলে তার হাতের বন্ধন,
বালক শুধাল, 'আমার প্রতি কেন এই বিচার।'
শুনল, বিধবা মা জানিয়েছে,
শিখধর্ম নয় তার ছেলের ;

বলেছে, শিখেরা তাকে জোর করে রেখেছিল
বন্দী করে।

ক্ষোভে লজ্জায় রক্তবর্ণ হল
বালকের মুখ।
বলে উঠল, 'চাই নে প্রাণ মিথ্যার কৃপায়,
সত্যে আমার শেষ মুক্তি,
আমি শিখ।'

চৌত্রিশ

পথিক আমি।
পথ চলতে চলতে দেখেছি
পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তিনিঃস্ব।
দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাপের
অবমানিত ভগ্নশেষ,
তার বিজয় নিশান
বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মতো
গেছে উড়ে;
বিরাট অহংকার
হয়েছে সাষ্টাঙ্গে ধুলায় প্রণত—
সেই ধুলার 'পরে সন্ধ্যাবেলায়
ভিক্ষুক তার জীর্ণ কাঁথা মেলে বসে,
পথিকের শ্রান্ত পদ
সেই ধুলায় ফেলে চিহ্ন,
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে
সে চিহ্ন যায় লুপ্ত হয়ে।

দেখেছি সুদূর যুগান্তর
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন—
যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপ্‌টা লেগে
কোন্‌ মহাতরী
হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে।

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।

পঁয়ত্রিশ

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য।
—যে কথা দেহের অতীত।

খাঁচার পাখির কণ্ঠে যে বাণী
সে তো কেবল খাঁচারই নয়,
তার মধ্যে গোপনে আছে সুদূর অগোচরের অরণ্যমর্মর,
আছে করুণ বিস্মৃতি।

সামনে তাকিয়ে চোখের দেখা দেখি—
এ তো কেবলই দেখার জাল-বোনা নয়।
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকেন নির্নিমেষে
দেশ-পারানো কোন্ দেশের দিকে,
দিগ্‌বলয়ের ইঙ্গিতলীন
কোন্ কল্পলোকের অদৃশ্য সংকেতে।

দীর্ঘ পথ ভালোমন্দয় বিকীর্ণ,
রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখসুখের বন্ধুর পথে।

শুধু কেবল পথ চলাতেই কি এ পথের লক্ষ্য।
ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আসছে গানের আহ্বান,
তার সত্য মিলবে কোন্‌খানে।

মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ।
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তার শেষ।
উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ—
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই।

ছত্রিশ

শীতের রোদ্‌দুর।
সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ
স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুনবনে।
বেগ্‌নি ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা
ঝুরি-নামা বৃদ্ধ বট
ডাল মেলেছে রাস্তার ও পার পর্যন্ত।
ফলসাগাছের ঝরা পাতা
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে,
ধুলোর সাঙাত হয়ে।

কাজ-ভোলা এই দিন
উধাও বলাকার মতো
লীন হয়ে চলেছে নিঃসীম নীলিমায়।
ঝাউগাছের মর্মরধ্বনিতে মিশে
মনের মধ্যে এই কথাটি উঠছে বেজে
'আমি আছি'।

কুয়োতলার কাছে
সামান্য ওই আমের গাছ ;
সারা বছর ও থাকে আত্মবিস্মৃত ;
বনের সাধারণ সবুজের আবরণে
ও থাকে ঢাকা।
এমন সময় মাঘের শেষে
হঠাৎ মাটির নীচে
শিকড়ে শিকড়ে তার শিহর লাগে,
শাখায় শাখায় মুকুলিত হয়ে ওঠে বাণী
'আমি আছি'।
চন্দ্রসূর্যের আলো আপন ভাষায়
স্বীকার করে তার সেই ভাষা।

অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে
হাসেন অন্তর্যামী ;
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে,
কবির গানের সুর দিয়ে—
তখন যে-আমি ধূলিধূসর সামান্য দিনগুলির মধ্যে মিলিয়ে ছিল
সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্য আলোকে।
সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ
কোনো রত্নভাণ্ডারে থেকে যায় কি না জানি নে ;

এইটুকু জানি—
তারা এসেছে আমার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে,
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
'আমি আছি'।

সাঁইত্রিশ

বিশ্বলক্ষ্মী,
তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে দারুণ তপস্যায়
রুদ্রের চরণতলে।
তোমার তনু হল উপবাসে শীর্ণ,
পিঙ্গল তোমার কেশপাশ।

দিনে দিনে দুঃখকে তুমি দগ্ধ করলে
দুঃখেরই দহনে,
শুষ্ককে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলে
পূজার পুণ্যধূপে।
কালোকে আলো করলে,
তেজ দিলে নিস্তেজকে,
ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হল
ত্যাগের হোমাগ্নিতে।

দিগন্তে রুদ্রের প্রসন্নতা
ঘোষণা করলে মেঘগর্জনে,
অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে,
সুন্দরের করুণ চরণ
নেমে এল তার 'পরে।

আটত্রিশ

হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের
বদ্ধ ছিল আপনাতেই
পদ্মকুঁড়ির মতো।
সেদিন সংকীর্ণ সংসারে
একান্তে ছিল তোমার প্রেয়সী
যুগলের নির্জন উৎসবে ;
সে ঢাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে,
শ্রাবণের মেঘমালা
যেমন হারিয়ে ফেলে চাঁদকে
আপনারই আলিঙ্গনের
আচ্ছাদনে

এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে।
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়িগুলি—
সে প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।
বৃষ্টির জলে ভিজে সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই

তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।
রেণুর ভারে মন্থর বাতাস
তাকে জানিয়ে দিল
নীপনিকুঞ্জের আকূতি।

সেদিন অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের
দীক্ষা পেলে তুমি,
নিজের অন্তর-আঙিনায়
গড়ে তুললে অপূর্ব মূর্তিখানি
স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী।
যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী
তার রসরূপটিকে আসন দিলে
অনন্তের আনন্দমন্দিরে
ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে।

আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,
আজ তুমি হয়েছ কবি,
ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের-কাছে-উৎসর্গ-করা

উনচল্লিশ

ওরা এসে আমাকে বলে—
'কবি, মৃত্যুর কথা শুনতে চাই তোমার মুখে।'

আমি বলি—
মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।
তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তার আনন্দের প্রবাহ।
বলছে সে, 'চলো চলো ;
চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে ;
চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে
আমারই টানে, আমারই বেগে।'
বলছে, 'চুপ করে বোসো যদি
যা-কিছু আছে সমস্তকে আঁকড়িয়ে ধ'রে
তবে দেখবে, তোমার জগতে
ফুল গেল বাসি হয়ে,
পাঁক দেখা দিল শুকনো নদীতে,
ম্লান হল তোমার তারার আলো।'

বলছে, 'থেমো না, থেমো না ;
পিছনে ফিরে তাকিয়ো না ;
পেরিয়ে যাও পুরোনোকে, জীর্ণকে, ক্লান্তকে, অচলকে

'আমি মৃত্যুরাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণক্ষেত্রে।

'যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিই নি তাকে কোনো গর্তে আটক থাকতে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে—
সে সমুদ্র আমিই।

'বর্তমান চায় বর্তিয়ে থাকতে।
সে চাপাতে চায়
তার সব বোঝা তোমার মাথায়—
বর্তমান গিলে ফেলতে চায়
তোমার সব-কিছু আপন জঠরে।
তার পরে অবিচল থাকতে চায়

আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো
জাগরণহীন নিদ্রায়।
তাকেই বলে প্রলয়।

'এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে
আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি
অন্তহীন নব নব অনাগতে।'

চল্লিশ

পরিত্যাযা পৃথিবী সন্ত আয়ম্
উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য ।
—অথর্ববেদ

ঋষি কবি বলেছেন,
ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী,
শেষকালে এসে দাঁড়ালেন
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে

কে এই প্রথমজাত অমৃত,
কী নাম দেব তাকে ।
তাকেই বলি নবীন,
সে নিত্যকালের ।

কত জরা, কত মৃত্যু
বারে বারে ঘিরল তাকে চার দিকে ।
সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে
বারে বারে সে বেরিয়ে এল ;
প্রতিদিন ভোরবেলার আলোতে
ধ্বনিত হল তার বাণী,
'এই আমি, প্রথমজাত অমৃত ।'

দিন এগোতে থাকে,
তপ্ত হয়ে ওঠে বাতাস,
আকাশ আবিল হয়ে ওঠে ধুলোয়,
বৃদ্ধ সংসারের কর্কশ কোলাহল
আবর্তিত হতে থাকে
দূর হতে দূরে।

কখন দিন আসে আপন শেষপ্রান্তে,
থেমে যায় তাপ,
নেমে যায় ধুলো,
শান্ত হয় কর্কশ কণ্ঠের পরিণামহীন বচসা,
আলোর যবনিকা সরে যায়
দিক্‌সীমার অন্তরালে।

অন্তহীন নক্ষত্রলোকে
ম্লানিহীন অন্ধকারে
জেগে ওঠে বাণী,
'এই আমি, প্রথমজাত অমৃত।'

শতাব্দীর পর শতাব্দী
আপনাকে ঘোষণা করে
মানুষের তপস্যায়।

সে তপস্যা
ক্লান্ত হয়,
হোমাগ্নি যায় নিবে,
মন্ত্র হয় অর্থহীন,
জীর্ণ সাধনার শতছিদ্র মলিন আচ্ছাদন
ম্রিয়মাণ শতাব্দীকে ফেলে ঢেকে
অবশেষে কখন
শেষ সূর্যাস্তের তোরণদ্বারে
নিঃশব্দচরণে আসে
যুগান্তের রাত্রি,
অন্ধকারে জপ করে শান্তিমন্ত্র
শবাসনে সাধকের মতো।
বহুবর্ষব্যাপী প্রহর যায় চ'লে,
নবযুগের প্রভাত
শুভ্র শঙ্খ হাতে
দাঁড়ায় উদয়াচলের স্বর্ণশিখরে,
দেখা যায়—
তিমিরধারায় ক্ষালন করেছে কে
ধূলিশায়ী শতাব্দীর আবর্জনা;
ব্যাপ্ত হয়েছে অপরিসীম ক্ষমা
অন্তর্হিত অপরাধের
কলঙ্কচিহ্নের 'পরে;

পেতেছে শান্ত জ্যোতির আসন
প্রথমজাত অমৃত।

বালক ছিলেম,
নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে
ধরণীর সবুজে,
আকাশের নীলিমায়।
দিন এগোলো।
চলল জীবনযাত্রার রথ
এ পথে, ও পথে।
ক্ষুব্ধ অন্তরের তাপতপ্ত নিশ্বাস
শুকনো পাতা ওড়ালো দিগন্তে।
চাকার বেগে
বাতাস ধুলায় হল নিবিড়।
আকাশচর কল্পনা
উড়ে গেল মেঘের পথে,
ক্ষুধাতুর কামনা
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে
ঘুরে বেড়ালো ধরাতলে
ফলের বাগানে, ফসলের খেতে,
আহূত অনাহূত।

শেষ সপ্তক

আকাশে পৃথিবীতে
এ জন্মের ভ্রমণ হল সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৪২

একচল্লিশ

হালকা আমার স্বভাব,
মেঘের মতো না হোক
গিরিনদীর মতো।
আমার মধ্যে হাসির কলরব
আজও থামল না।
বেদীর থেকে নেমে আসি,
রঙ্গমঞ্চে বসে বাঁধি নাচের গান,
তার বায়না নিয়েছি প্রভুর কাছে।
কবিতা লিখি,
তার পদে পদে ছন্দের ভঙ্গিমায়
তারুণ্য ওঠে মুখর হয়ে,
ঝিঁঝিট খাম্বাজের ঝংকার দিতে
আজও সে সংকোচ করে না।

আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের
রহস্যসখা।
তিনি অর্বাচীন নবীনদের কাছে
প্রবীণ বয়সের প্রমাণ দিতে
ভুলেই গেছেন।

তরুণের উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে
উতরোল তাঁর কৌতুক,
তাদের উদ্দাম নৃত্যে
বাজান তিনি দ্রুত তালের মৃদঙ্গ।
তাঁর বজ্রমন্দ্রিত গাম্ভীর্য মেঘমেদুর অম্বরে,
অজস্র তাঁর পরিহাস
বিকশিত কাশবনে,
শরতের অকারণ হাস্যহিল্লোলে।
তাঁর কোনো লোভ নেই
প্রধানদের কাছে মর্যাদা পাবার;
তাড়াতাড়ি কালো পাথর চাপা দেন না
চাপল্যের ঝরনার মুখে।
তাঁর বেলাভূমিতে
ভঙ্গুর সৈকতের ছেলেমানুষি
প্রতিবাদ করে না সমুদ্রের।
আমাকে চান টেনে রাখতে তাঁর বয়স্যদলে;
তাই আমার বার্ধক্যের শিরোপা
হঠাৎ নেন কেড়ে,
ফেলে দেন ধুলোয়—
তার উপর দিয়ে নেচে নেচে
চলে যায় বৈরাগী,
পাঁচ-রঙের-তালি-দেওয়া আলখাল্লা প'রে।

যারা আমার মূল্য বাড়াতে চায়,
পরায় আমাকে দামি সাজ,
তাদের দিকে চেয়ে
তিনি ওঠেন হেসে—
ও সাজ আর টিঁকতে পায় না
আনমনার অনবধানে।

আমাকে তিনি চেয়েছেন
নিজের অবারিত মজলিসে—
তাই ভেবেছি, যাবার বেলায় যাব
মান খুইয়ে,
কপালের তিলক মুছে,
কৌতুকে রসোল্লাসে।
এসো আমার অমানী বন্ধুরা
মন্দিরা বাজিয়ে—
তোমাদের ধুলো-মাখা পায়ে
যদি ঘুঙর বাঁধা থাকে
লজ্জা পাব না।

বিয়াল্লিশ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত
প্রিয়বরেষু

তুমি গল্প জমাতে পার।
বোসো তোমার কেদারায়,
ধীরে ধীরে টান দাও গুড়্‌গুড়িতে,
উছলে ওঠে আলাপ
তোমার ভিতর থেকে
হালকা ভাষায়,
যেন নিরাসক্ত ঔৎসুক্যে,
তোমার কৌতুকে-ফেনিল মনের
কৌতূহলের উৎস থেকে

ঘুরেছ নানা জায়গায় নানা কাজে,
আপন দেশে, অন্য দেশে।
মনটা মেলে রেখেছিলে চার দিকে,
চোখটা ছিলে খুলে।
মানুষের যে পরিচয়
তার আপন সহজ ভাবে,
যেমন-তেমন অখ্যাত ব্যাপারের ধারায়

দিনে দিনে যা গাঁথা হয়ে ওঠে,
সামান্য হলেও যাতে আছে
সত্যের ছাপ,
অকিঞ্চিৎকর হলেও যার আছে বিশেষত্ব,
সেটা এড়ায় নি তোমার দৃষ্টি।
সেইটে দেখাই সহজ নয়,
পণ্ডিতের দেখা সহজ।

শুনেছি তোমার পাঠ ছিল সায়ান্সে,
শুনেছি শাস্ত্রও পড়েছ সংস্কৃত ভাষায়;
পার্সি জবানিও জানা আছে।
গিয়েছ সমুদ্রপারে,
ভারতে রাজসরকারের
ইম্পীরিয়ল রথযাত্রায় লম্বা দড়িতে
'হেঁইয়ো' বলে দিতে হয়েছে টান।
অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি
মগজে বোঝাই হয়েছে কম নয়-
পুঁথির থেকেও কিছু,
মানুষের প্রাণযাত্রা থেকেও বিস্তর

তবু সব-কিছু নিয়ে
তোমার যে পরিচয় মুখ্য

সে তোমার আলাপ-পরিচয়ে।
তুমি গল্প জমাতে পার।
তাই যখন-তখন দেখি
তোমার ঘরে মানুষ লেগেই আছে—
কেউ তোমার চেয়ে বয়সে ছোটো,
কেউ বয়সে বেশি।

গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি কর না,
এই তোমার বাহাদুরি।
তুমি মানুষকে জান, মানুষকে জানাও,
জীবলীলার মানুষকে।

একে নাম দিতে পারি সাহিত্য,
সব-কিছুর কাছে থাকা।
তুমি জমা করেছ তোমার মনে
নানা লোকের সঙ্গ,
সেইটে দিতে পার সবাইকে
অনায়াসে—
সেইটেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের তকমা পরিয়ে
পণ্ডিত-পেয়াদা সাজাও না
থম্‌কিয়ে দিতে ভালোমানুষকে।

তোমার জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারটা
পূর্ণ আছে যথাস্থানেই।
সেটা বৈঠকখানাকে কোণ-ঠেসা করে রাখে নি
যেখানে আসন পাতো
গল্পের ভোজে
সেখানে ক্ষুধিতের পাতের থেকে ঠেকিয়ে রাখ
লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরিকে।

একটিমাত্র কারণ—
মানুষের 'পরে আছে তোমার দরদ,
যে মানুষ চলতে চলতে হাঁপিয়ে ওঠে
সুখদুঃখের দুর্গম পথে,
বাঁধা পড়ে নানা বন্ধনে
ইচ্ছায় অনিচ্ছায়—
যে মানুষ বাঁচে,
যে মানুষ মরে
অদৃষ্টের গোলকধাঁদার পাকে।
সে মানুষ রাজাই হোক, ভিখিরিই হোক,
তার কথা শুনতে মানুষের অসীম আগ্রহ।

তার কথা যে লোক পারে বলতে সহজেই
সেই পারে,

অন্যে পারে না।
বিশেষ এই হাল-আমলে।
আজ মানুষের জানাশোনা
তার দেখাশোনাকে
দিয়েছে আপাদমস্তক ঢেকে।
একটু ধাক্কা পেলে
তার মুখে নানা কথা অনর্গল ছিটকে পড়ে—
নানা সমস্যা, নানা তর্ক ;
একান্ত মানুষের আসল কথাটা
যায় খাটো হয়ে।

আজ বিপুল হল সমস্যা,
বিচিত্র হল তর্ক,
দুর্ভেদ্য হল সংশয় ;
আজকের দিনে
সেইজন্যেই এত করে বন্ধুকে খুঁজি,
মানুষের সহজ বন্ধুকে
যে গল্প জমাতে পারে।
এ দুর্দিনে
মাস্টারমশায়কেও অত্যন্ত দরকার।
তাঁর জন্যে ক্লাস আছে
পাড়ায় পাড়ায়—

প্রায়মারি, সেকেণ্ডারি।
গল্পের মজলিস জোটে দৈবাৎ।

সমুদ্রের ও পারে
একদিন ওরা গল্পের আসর খুলেছিল,
তখন ছিল অবকাশ;
ওরা ছেলেদের কাছে শুনিয়েছিল
রবিন্‌সন ক্রুসো,
সকল বয়সের মানুষের কাছে
ডন কুইক্‌সোট।
দুরূহ ভাবনার আঁধি লাগল
দিকে দিকে;
লেক্‌চারের বান ডেকে এল,
জলে স্থলে কাদায় পাঁকে
গেল ঘুলিয়ে।
অগত্যা
অধ্যাপকেরা জানিয়ে দিলে
একেই বলে গল্প।

বন্ধু,
দুঃখ জানাতে এলুম
তোমার বৈঠকে।

আজকালের ছাত্রেরা দেয়
আজকালের দোহাই।
আজকালের মুখরতায়
তাদের অটুট বিশ্বাস।
হায় রে, আজকাল
কত ডুবে গেল কালের মহাপ্লাবনে
মোটা-দামের-মার্কা-মারা
পসরা নিয়ে।
যা চিরকালের
তা আজ যদি বা ঢাকা পড়ে
কাল উঠবে জেগে।
তখন মানুষ আবার বলবে খুশি হয়ে,
"গল্প বলো।"

তেতাল্লিশ

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন ক'রে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

রথে চড়ে চলেছে কাল—
পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে ধরে,
পায় কিছু পানীয় ;
পান সারা হলে
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে ;
চাকার তলায়
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে।

তার পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে
পায় নতুন রস,
একই তার নাম
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন।

একদিন ছিলেম বালক।
কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে
সেই যে লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া
তোমরা তাকে কেউ জান না।
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে
কেউ নেই তারা।
সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে,
না আছে কারো স্মৃতিতে।
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে ;
তার সেদিনকার কান্নাহাসির
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো হাওয়ায়।
তার ভাঙা খেলনার টুকরোগুলোও
দেখি নে ধুলোর 'পরে।

সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্ষের কাছে
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।

তার বিশ্ব ছিল
সেইটুকু ফাঁকের বেষ্টনীর মধ্যে।
তার অবোধ চোখ মেলে চাওয়া
ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলটাতে
সারি সারি নারকেল গাছে।
সন্ধেবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড় ;
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে
বেড়া ছিল না উঁচু,
মনটা এ দিক থেকে ও দিকে
ডিঙিয়ে যেত অনায়াসেই।
প্রদোষের আলো-আঁধারে
বস্তুর সঙ্গে ছায়াগুলো ছিল জড়িয়ে,
দুইই ছিল এক গোত্রের।

সে কয়দিনের জন্মদিন
একটা দ্বীপ,
কিছুকাল ছিল আলোতে,
কালসমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে।
ভাঁটার সময় কখনো কখনো
দেখা যায় তার পাহাড়ের চূড়া,
দেখা যায় প্রবালের রক্তিম তটরেখা।

পঁচিশে বৈশাখ তার পরে দেখা দিল
আর-এক কালান্তরে,
ফাল্গুনের প্রত্যুষে
রঙিন আভার অস্পষ্টতায়।
তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়ালো
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে।

সেই শুনে কোনো কোনো দিন বা
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তাঁর কোনো কোনো দূতীকে
পলাশবনের রঙমাতাল ছায়াপথে
কাজ-ভোলানো সকাল-বিকালে।
তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি;
কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝি নি।
দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর
বেদনা;

শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।

তারা রেখে গেছে আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের
প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে
নতুন-ফোটা বেলফুলের মালা ;
ভোরের স্বপ্ন
তারই গন্ধে ছিল বিহ্বল।

সেদিনকার জন্মদিনের কিশোর জগৎ
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই,
জানা না-জানার সংশয়ে।
সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে
কখনো বা ছিল ঘুমিয়ে,
কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে
সোনার কাঠির পরশ লেগে।

দিন গেল।
সেই বসন্তীরঙের পঁচিশে বৈশাখের
রঙকরা প্রাচীরগুলো
পড়ল ভেঙে।

যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগত কাঁপন,
হাওয়ায় জাগত মর্মর,
বিরহী কোকিলের
কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।

সেদিনকার কিশোরক
সুর সেধেছিল যে একতারায়
একে একে তাতে চড়িয়ে দিল
তারের পর নতুন তার।
সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।
বেলা-অবেলায়
ধ্বনিতে ধ্বনিতে গেঁথে
জাল ফেলেছি মাঝ-দরিয়ায়;

কোনো মন দিয়েছে ধরা,
ছিন্ন জালের ভিতর থেকে
কেউ বা গেছে পালিয়ে।

কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য,
গ্লানিভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্ণে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্তপ্রতিমা ;
সেবাকে তারা সুন্দর করে,
তপঃক্লান্তের জন্যে তারা
আনে সুধার পাত্র ;
ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে ;
তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে-ঢাকা অঙ্গারের থেকে ;
তারা আকাশবাণীকে ডেকে আনে
প্রকাশের তপস্যায়।
তারা আমার নিবে-আসা দীপে
জ্বালিয়ে গেছে শিখা,
শিথিল-হওয়া তারে

বেঁধে দিয়েছে সুর,
পঁচিশে বৈশাখকে
বরণমাল্য পরিয়েছে
আপন হাতে গেঁথে।
তাদের পরশমণির ছোঁওয়া
আজও আছে
আমার গানে, আমার বাণীতে।

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরী।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়-পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে—
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।

বিদ্বেষে অনুরাগে,
ঈর্ষায় মৈত্রীতে,
সংগীতে পরুষ-কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে।
এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।

জেনেছ কি—
আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত,
অনেক ছিন্নবিচ্ছিন্ন,
অনেক উপেক্ষিত।
অন্তরে বাহিরে
সেই ভালো মন্দ,
স্পষ্ট অস্পষ্ট,
খ্যাত অখ্যাত,
ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায়

আজ প্রতিফলিত—
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা-
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষ বেলাকার পরিচয় ব'লে
নিলেম স্বীকার করে,
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল ব'লে
করব না অহংকার।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে-গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে,
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়

চুয়াল্লিশ

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে-পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি ;
ভাঙা থামে নালিশ উঁচু ক'রে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে ;
ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক'রে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
মৃতদিনের প্রেতের বাসা।

সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিত
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জনা,
যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে—

যার মধ্যে শত শত শতাব্দীর
রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ
গেছে নিঃশব্দ হয়ে।

সেই মাটির ছাদের নীচে বসব আমি
রোজ সকালে শৈশবে যা ভরেছিল
আমার গাঁটবাঁধা চাদরের কোণা
এক-এক মুঠো চাঁপা আর বেল ফুলে,
মাঘের শেষে যার আমের বোল
দক্ষিণের হাওয়ায়
অলক্ষ্য দূরের দিকে ছড়িয়েছিল
ব্যথিত যৌবনের আমন্ত্রণ।

আমি ভালো বেসেছি
বাংলাদেশের মেয়েকে
যে দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন,
ওর কচি ধানের চিকন আভা।
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
ওই মাটির দিগন্তে
নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির
নিমীলনে।

প্রতিদিন আমার ঘরের সুপ্ত মাটি
সহজে উঠবে জেগে
ভোরবেলাকার সোনার কাঠির
প্রথম ছোঁওয়ায় ;
তার চোখ-জুড়ানো শ্যামলিমায়
স্মিত হাসি কোমল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে
চৈত্ররাতের চাঁদের
নিদ্রাহারা মিতালিতে।

চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
পদ্মার ভাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউবনে,
গাঙশালিকের হাজার খোপের বাসায়,
সর্ষে-তিসির দুইরঙা খেতে,
গ্রামের সরু বাঁকা পথের ধারে,
পুকুরের পাড়ির উপরে।

আমার দু চোখ ভ'রে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘুঘুডাকা দুপুরবেলায়
রাঙা পথের ও পারে,
যেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে

চরে বেড়ায় ছুটি-চারটি গোরু
নিরুৎসুক আলস্যে
লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে,
যেখানে সাথিবিহীন
তালগাছের মাথায়
সঙ্গ-উদাসীন নিভৃত চিলের বাসা।

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষ বেলায়।
এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,
যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে
নবদূর্বাশ্যামলের
করুণ পদস্পর্শে
চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়,
নব জীবনের বিস্মিত প্রভাতে।

পঁয়তাল্লিশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী
কল্যাণীয়েষু

তখন আমার আয়ুর তরণী
যৌবনের ঘাট গেছে পেরিয়ে।
যে-সব কাজ প্রবীণকে প্রাজ্ঞকে মানায়
তাই নিয়ে পাকা করছিলেম
পাকা চুলের মর্যাদা।

এমন সময়ে আমাকে ডাক দিলে
তোমার সবুজ-পত্রের আসরে।
আমার প্রাণে এনে দিলে পিছুডাক ;
খবর দিলে,
নবীনের দরবারে আমার ছুটি মেলে নি।
দ্বিধার মধ্যে মুখ ফিরালেম
পেরিয়ে-আসা পিছনের দিকে।
পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি
দেখা দিল আমার চোখের সম্মুখে।

ভরা যৌবনের দিনেও
যৌবনের সংবাদ
এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগে নি আমার লেখনীতে।
আমার মন বুঝল
যৌবনকে না ছাড়ালে
যৌবনকে যায় না পাওয়া।

আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।
পুবের দিক্‌ থেকে হাওয়ায় আসে
পিছুডাক,
দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে।
আজ সামনে দেখা দিল
এ জন্মের সমস্তটা।

যাকে ছেড়ে এলেম
তাকেই নিচ্ছি চিনে।
সরে এসে দেখছি
আমার এত কালের সুখদুঃখের ওই সংসার,
আর তার সঙ্গে
সংসারকে পেরিয়ে কোন্‌ নিরুদ্দিষ্ট।
ঋষিকবি প্রাণপুরুষকে বলেছেন,
'ভুবন সৃষ্টি করেছ

তোমার এক অর্ধেককে দিয়ে,
বাকি আধখানা কোথায়
তা কে জানে।'
সেই একটি আধখানা আমার মধ্যে আজ ঠেকেছে
আপন প্রান্তরেখায় ;
দুই দিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,
দুই বিরাট আধখানা—
তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শেষ কথা বলে যাব,
'দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালো বেসেছি।'

ছেচল্লিশ

তখন আমার বয়স ছিল সাত।
ভোরের বেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে
অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,
বেরিয়ে আসছে কোমল আলো
নতুন-ফোটা কাঁটালি চাঁপার মতো।

বিছানা ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে
কাক ডাকবার আগে,
পাছে বঞ্চিত হই
কম্পমান নারকেল-শাখাগুলির মধ্যে
সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে।

তখন প্রতি দিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন।
যে প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে
আলোতে স্নান করে আসত
রক্তচন্দনের তিলক এঁকে ললাটে,
সে আমার জীবনে আসত নতুন অতিথি,

হাসত আমার মুখে চেয়ে।
আগেকার দিনের কোনো চিহ্ন ছিল না তার উত্তরীয়ে।

তার পরে বয়স হল
কাজের দায় চাপল মাথার 'পরে।
দিনের পরে দিন তখন হল ঠাসাঠাসি।
তারা হারালো আপনার স্বতন্ত্র মর্যাদা।
এক দিনের চিন্তা আর-এক দিনে হল প্রসারিত,
এক দিনের কাজ আর-এক দিনে পাতল আসন।
সেই একাকার-করা সময় বিস্তৃত হতে থাকে,
নতুন হতে থাকে না—
একটানা বয়েস কেবলই বেড়ে ওঠে,
ক্ষণে ক্ষণে শমে এসে
চিরদিনের ধুয়োটির কাছে
ফিরে ফিরে পায় না আপনাকে।

আজ আমার প্রাচীনকে নতুন করে নেবার দিন এসেছে।
ওঝাকে ডেকেছি, ভূতকে দেবে নামিয়ে।
গুণীর চিঠিখানির জন্যে
প্রতিদিন বসব এই বাগানটিতে—
তাঁর নতুন চিঠি
ঘুমভাঙার জানলাটার কাছে।

প্রভাত আসবে
আমার নতুন পরিচয় নিতে,
আকাশে অনিমেষ চক্ষু মেলে
আমাকে সুধাবে
'তুমি কে'।
আজকের দিনের নাম
খাটবে না কালকের দিনে

সৈন্যদলকে দেখে সেনাপতি,
দেখে না সৈনিককে—
দেখে আপন প্রয়োজন,
দেখে না সত্য,
দেখে না স্বতন্ত্র মানুষের
বিধাতাকৃত আশ্চর্য রূপ।
এতকাল তেমনি করে দেখেছি সৃষ্টিকে,
বন্দিদলের মতো
প্রয়োজনের এক শিকলে বাঁধা।
তার সঙ্গে বাঁধা পড়েছি
সেই বন্ধনে নিজে।

আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে

নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে।
এ নৌকোয় মাল নেব না কিছুই,
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে।

সংযোজন

সংযোজন-সূচীপত্র

প্রথম ছত্র -সূচীতে বিন্দুচিহ্নিত

পৃষ্ঠা : ১৯৫ আমি

১৯৯ আষাঢ়

১৯১ । ২০৮ ঘট ভরা

১৮৩ দুঃখজাল

১৭৭ প্রশ্ন

১৮৬ বাতাবির চারা

২০১ মর্মবাণী

১৭৯ যক্ষ

১৭৫ স্মৃতিপাথেয়

স্মৃতিপাথেয়

একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে
সে কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাসে
অন্যমনা আত্মভোলা
যৌবনেরে দিয়ে ঘন দোলা
মুখে তব অকস্মাৎ প্রকাশিল কী অমৃতরেখা,
কভু যার পাই নাই দেখা,
দুর্লভ সে প্রিয়
অনির্বচনীয়।

যে মহা-অপরিচিত
এক পলকের লাগি হয় সচকিত
গভীর অন্তরতর প্রাণে
কোন্ দূর বনান্তের পথিকের গানে,
যে অপূর্ব আসে ঘরে
পথহারা মুহূর্তের তরে
বৃষ্টিধারামুখরিত নির্জন প্রবাসে
সন্ধ্যাবেলা যূথিকার সকরুণ স্নিগ্ধ গন্ধশ্বাসে,
চিত্তে রেখে দিয়ে গেল চিরস্পর্শ স্বীয়
তাহারি স্খলিত উত্তরীয়।

সে বিস্মিত ক্ষণিকেরে পড়ে মনে
কোনোদিন অকারণে ক্ষণে ক্ষণে
শীতের মধ্যাহ্নকালে গোরু-চরা শস্যরিক্ত মাঠে
চেয়ে চেয়ে বেলা যবে কাটে।
সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে সে স্মৃতির ছবি
সূর্যাস্তের পার হতে বাজায় পুরবী।
পেয়েছি যে-সব ধন যার মূল্য আছে
ফেলে যাই পাছে।
সেই যার মূল্য নাই, জানিবে না কেও
সঙ্গে থাকে অখ্যাত পাথেয়।

দুই-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়

বাতাবির চারা

একদিন শান্ত হলে আষাঢ়ের ধারা
বাতাবির চারা
আসন্নবর্ষণ কোন্ শ্রাবণপ্রভাতে
রোপণ করিলে নিজহাতে
আমার বাগানে।

বহুকাল গেল চলি ; প্রখর পৌষের অবসানে
কুহেলী ঘুচালো যবে কৌতূহলী ভোরের আলোক,
সহসা পড়িল চোখ—
হেরিনু শিশিরে ভেজা সেই গাছে
কচিপাতা ধরিয়াছে,
যেন কী আগ্রহে
কথা কহে,
যে কথা আপনি শুনে পুলকেতে দুলে ;
যেমন একদা কবে তমসার কূলে
সহসা বাল্মীকিমুনি
আপনার কণ্ঠ হতে আপন প্রথম ছন্দ শুনি'
আনন্দসঘন
গভীর বিস্ময়ে নিমগন।

কোথায় আছ না-জানি এ সকালে
কী নিষ্ঠুর অন্তরালে—
সেথা হতে কোনো সম্ভাষণ
পরশে না এ প্রান্তের নিভৃত আসন।
হেনকালে অকস্মাৎ নিঃশব্দের অবহেলা হতে
প্রকাশিল অরুণ আলোতে
এ কয়টি কিশলয়।
এরা যেন সেই কথা কয়
বলিতে পারিতে যাহা তবু না বলিয়া
চলে গেছ প্রিয়া।

সেদিন বসন্ত ছিল দূরে—
আকাশ জাগে নি সুরে,
অচেনার যবনিকা কেঁপেছিল ক্ষণে ক্ষণে,
তখনো যায় নি সরে দুরন্ত দক্ষিণসমীরণে
প্রকাশের উচ্ছৃঙ্খল অবকাশ না ঘটিতে,
পরিচয় না রটিতে,
ঘণ্টা গেল বেজে।
অব্যক্তের অনালোকে সায়াহ্নে গিয়েছ সভা ত্যেজে।

তিন-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়

শেষ পর্ব

যেথা দূর যৌবনের প্রান্তসীমা
সেথা হতে শেষ অরুণিমা
শীর্ণপ্রায়
আজি দেখা যায়।

সেথা হতে ভেসে আসে
চৈত্রদিবসের দীর্ঘশ্বাসে
অস্ফুট মর্মর,
কোকিলের ক্লান্ত স্বর,
ক্ষীণস্রোত তটিনীর অলস কল্লোল—
রক্তে লাগে মৃদুমন্দ দোল।

এ আবেশ মুক্ত হোক;
ঘোর-ভাঙা চোখ
শুভ্র সুস্পষ্টের মাঝে জাগিয়া উঠুক।
রঙ-করা দুঃখ সুখ
সন্ধ্যার মেঘের মতো যাক সরে
আপনারে পরিহাস করে।

মুছে যাক সেই ছবি— চেয়ে থাকা পথপানে,
কথা কানে কানে,
মৌনমুখে হাতে হাত ধরা,
রজনীগন্ধায় সাজি ভরা,
চোখে চোখে চাওয়া,
দুরুদুরু বক্ষ নিয়ে আসা আর যাওয়া।

যে খেলা আপনা-সাথে সকালে বিকালে
ছায়া অন্তরালে,
সে খেলার ঘর হতে
হল আসিবার বেলা বাহির-আলোতে।
ভাঙিব মনের বেড়া কুসুমিত-কাঁটালতা-ঘেরা,
যেথা স্বপনেরা
মধুগন্ধে মরে ঘুরে ঘুরে
গুন্ গুন্ সুরে।
নেব আমি বিপুল বৃহৎ
আদিম প্রাণের দেশ— তেপান্তর মাঠের সে পথ
সাত সমুদ্রের তটে তটে
যেখানে ঘটনা ঘটে,
নাই তার দায়,
যেতে যেতে দেখা যায়, শোনা যায়,
দিনরাত্রি যায় চলে

নানা ছন্দে নানা কলরোলে।

থাক্ মোর তরে
আপক্ক ধানের ক্ষেত অঘ্রানের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে ;
সোনার তরঙ্গদোলে
মুগ্ধ দৃষ্টি যার 'পরে ভেসে যায় চলে
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে,
যেথায় অদৃশ্য সাথি লীলাভরে
সারাদিন ভাসায় প্রহর যত
খেলার নৌকার মতো।

দূরে চেয়ে রব আমি স্থির
ধরণীর
বিস্তীর্ণ বক্ষের কাছে
যেথা শাল গাছে
সহস্র বর্ষের প্রাণ সমাহিত রয়েছে নীরবে
নিস্তব্ধ গৌরবে।
কেটে যাক আপনা-ভোলানো মোহ,
কেটে যাক আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,
প্রতি বৎসরের আয়ু কর্তব্যের আবর্জনাভার
না করুক স্তূপাকার—
নির্ভাবনা তর্কহীন শাস্ত্রহীন পথ বেয়ে বেয়ে

যাই চলে অর্থহীন গান গেয়ে গেয়ে।

প্রাণে আর চেতনায় এক হয়ে ক্রমে
আনায়াসে মিলে যাব মৃত্যুমহাসাগরসংগমে,
আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব হয়ে ক্ষীণ
গোধূলি নিঃশব্দ রাত্রে যেমন অতলে হয় লীন

জোড়াসাঁকো
৫ এপ্রিল ১৯৩৪

চার-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়

দুঃখজাল

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চার দিকে ;
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দুর্‌গ্রহদের মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়।
লাগছে মনে এই জীবনের মূল্য নেই,
আজকে দিনের চিত্তদাহের তুল্য নেই।
যেন এ দুখ অন্তহীন,
ঘরছাড়া মন ঘুরবে কেবল পন্থহীন।

এমন সময় অকস্মাৎ
মনের মধ্যে হানল চমক তড়িদ্‌ঘাত,
এক নিমেষেই ভাঙল আমার বন্ধ দ্বার,
ঘুচল হঠাৎ অন্ধকার।
সুদূর কালের দিগন্তলীন বাগ্‌বাদিনীর পেলেম সাড়া,
শিরায় শিরায় লাগল নাড়া।
যুগান্তরের ভগ্নশেষে
ভিত্তিছায়ায় ছায়ামূর্তি মুক্তকেশে
বাজায় বীণা ; পূর্বকালের কী আখ্যানে

উদার সুরের তানের তন্তু গাঁথছে গানে ;
দুঃসহ কোন্ দারুণ দুখের স্মরণ-গাঁথা
করুণ গাথা ;
দুর্দাম কোন্ সর্বনাশের ঝঞ্ঝাঘাতের
মৃত্যুমাতাল বজ্রপাতের
গর্জরবে
রক্তরঙিন যে উৎসবে
রুদ্রদেবের ঘূর্ণিনৃত্যে উঠল মাতি
প্রলয়রাতি,
তাহারই ঘোর শঙ্কাকাঁপন বারে বারে
ঝংকারিয়া কাঁপছে বীণার তারে তারে।

জানিয়ে দিলে আমায়, অয়ি
অতীত কালের হৃদয়পদ্মে নিত্য-আসীন ছায়াময়ী,
আজকে দিনের সকল লজ্জা সকল গ্লানি
পাবে যখন তোমার বাণী,
বর্ষশতের ভাসান-খেলার নৌকা যবে
অদৃশ্যেতে মগ্ন হবে,
মর্মদহন দুঃখশিখা
হবে তখন জ্বলন-বিহীন আখ্যায়িকা,
বাজবে তারা অসীম কালের নীরব গীতে
শান্ত গভীর মাধুরীতে।

ব্যথার ক্ষত মিলিয়ে যাবে নবীন ঘাসে,
মিলিয়ে যাবে সুদূর যুগের শিশুর উচ্চহাসে।

২৮ আষাঢ় ১৩৪১

দশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়

মর্মবাণী

শিল্পীর ছবিতে যাহা মূর্তিমতী,
গানে যাহা ঝরে ঝরনায়,
সে বাণী হারায় কেন জ্যোতি,
কেন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়
মুখের কথায়
সংসারের মাঝে
'নিরন্তর প্রয়োজনে জনতার কাজে ?
কেন আজ পরিপূর্ণ ভাষা দিয়ে
পৃথিবীর কানে কানে বলিতে পারি নে 'প্রিয়ে
ভালোবাসি' ?
কেন আজ সুরহারা হাসি,
যেন সে কুয়াশা-মেলা
হেমন্তের বেলা ?

অনন্ত অম্বর
অপ্রয়োজনের সেথা অখণ্ড প্রকাণ্ড অবসর,
তারি মাঝে এক তারা অন্য তারকারে

জানাইতে পারে
আপনার কানে কানে কথা।
তপস্বিনী নীরবতা
আসন বিস্তীর্ণ যার অসংখ্য যোজন দূর ব্যেপে
অন্তরে অন্তরে উঠে কেঁপে
আলোকের নিগূঢ় সংগীতে।
খণ্ড খণ্ড দণ্ডে পলে ভারাকীর্ণ চিতে
নাই সেই অসীমের অবসর ;
তাই অবরুদ্ধ তার স্বর,
ক্ষীণসত্য ভাষা তার।
প্রত্যহের অভ্যস্ত কথার
মূল্য যায় ঘুচে,
অর্থ যায় মুছে।
তাই কানে কানে
বলিতে সে নাহি জানে
সহজে প্রকাশি
'ভালোবাসি'।

আপন হারানো বাণী খুঁজিবারে,
বনস্পতি, আসি তব দ্বারে।
তোমার পল্লবপুঞ্জ শাখাব্যূহভার
অনায়াসে হয়ে পার

আপনার চতুর্দিকে মেলেছে নিস্তব্ধ অবকাশ।
সেথা তব নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস
সূর্যোদয়মহিমার পানে
আপনারে মিলাইতে জানে

অজানা সাগরপার হতে
দক্ষিণের বায়ুস্রোতে
অনাদি প্রাণের যে বারতা
তব নব কিশলয়ে রেখে যায় কানে কানে কথা,
তোমার অন্তরতম,
সে কথা জাগুক প্রাণে মম,
আমার ভাবনা ভরি উঠুক বিকাশি—
'ভালোবাসি'।
তোমার ছায়ায় ব'সে বিপুল বিরহ মোরে ঘেরে ;
বর্তমান মুহূর্তেরে
অবলুপ্ত করি দেয় কালহীনতায়।
জন্মান্তর হতে যেন লোকান্তরগত আঁখি চায়
মোর মুখে।
নিষ্কারণ দুখে
পাঠাইয়া দেয় মোর চেতনারে
সকল সীমার পারে।
দীর্ঘ অভিসারপথে সংগীতের সুর

তাহারে বহিয়া চলে দূর হতে দূর।
কোথায় পাথেয় পাবে তার
ক্ষুধা-পিপাসার,
এ সত্য বাণীর তরে তাই সে উদাসী—
'ভালোবাসি'।

ভোর হয়েছিল যবে যুগান্তের রাতি
আলোকের রশ্মিগুলি খুঁজি সাথি
এ আদিম বাণী
করেছিল কানাকানি
গগনে গগনে।
নবসৃষ্টি-যুগের লগনে
মহাপ্রাণসমুদ্রের কূল হতে কূলে
তরঙ্গ দিয়েছে তুলে
এ মন্ত্রবচন।
এই বাণী করেছে রচন
সুবর্ণকিরণ বর্ণে স্বপনপ্রতিমা
আমার বিরহাকাশে যেথা অস্তশিখরের সীমা।
অবসাদগোধূলির ধূলিজাল তারে
ঢাকিতে কি পারে?
নিবিড়সংহত করি এ জন্মের সকল ভাবনা
সকল বেদনা

দিনান্তের অন্ধকারে মম
সন্ধ্যাতারা-সম
শেষবাণী উঠুক উদ্ভাসি—
'ভালোবাসি'

ছাব্বিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়

এই
আমার ছেলেটা [redacted] কেমন যাবি [redacted]
সারা সকাল তোতা পাখি [redacted]
ঝরনা-ধারার নিচে। বসে থাকি একটি ধারে [redacted]
শেওলা-ঢাকা পিছল কালো পাথরটার পরে [redacted]।
ঘট ভরে যায় বারে বারে
ফেনিয়ে ওঠে, ছাপিয়ে [redacted] পড়ে [redacted] কিনারাতে।
সবুজ দিয়ে [redacted] মিলে-মিশে
শৈল শ্রেণীর [redacted] নীল আকাশে [redacted] দিকে দিকে।
ঝরঝরানির মাঝে ওঠে [redacted]
ভোরের ঘুমে ডাক শোনা যায়
জলের শব্দ [redacted] গাঁয়ের মেয়ের।
[redacted] যায় গোধূলে
কেমনি বড়ির ঝরির ঝিরঝিরানি
পাহাড়তলীর [redacted] রাস্তা ছেড়ে [redacted] যেখানে ঐ হাটের মানুষ
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াই পথে
বলদ দুটোর [redacted] পিঠে [redacted] বোঝাই
শুকনো কাঠের [redacted] আঁটি তো। ঝুনু ঝুনু ঘণ্টা বাজায় গলায় তাদের।
ঐ মস্তবানি যাবার ঠাঁয়ে
[redacted] ভাবনা আমার ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় চলে
[redacted]। যাযাবর যে দুই দিকের,
রাস্তা দিয়ে সকাল বেলার প্রথম রোদের রং,
উঠছে আঁকা হয়।
বক উড়ে যায় পাহাড় পেরিয়ে।
চুপ করে সব শুনি,
বেলা গেলো, ডাক পাঠায় ঘরে।
ঘট ভরাতে হয় না দেখি [redacted] ...
সবাই তারে,
ওর আমার [redacted], রাগ করে যে
[redacted] দেরি করলি কেন,
উঠতে পারা জলের কথা
কেউ
বুঝিতে না পেরে [redacted]। [redacted] [redacted] যায়,

ঘট ভরা

আমার এই ছোটো কলসখানি
সারা সকাল পেতে রাখি
ঝর্নাধারার নীচে।
বসে থাকি একটি ধারে
শেওলা-ঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে।
ঘট ভরে যায় বারে বারে—
ফেনিয়ে ওঠে, ছাপিয়ে পড়ে কেবলই।

সবুজ দিয়ে মিনে-করা
শৈলশ্রেণীর নীল আকাশে
ঝর্‌ঝরানির শব্দ ওঠে দিনে রাতে।
ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার
গাঁয়ের মেয়েরা।
জলের শব্দ যায় পেরিয়ে
বেগ্‌নি রঙের বনের সীমানা,
পাহাড়তলির রাস্তা ছেড়ে
যেখানে ওই হাটের মানুষ
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াইপথে,
বলদ-দুটোর পিঠে বোঝাই

শুক্‌নো কাঠের আঁঠি—
ঝুনুঝুনু ঘণ্টা গলায় বাঁধা।

ঝর্‌ঝরানি আকাশ ছাপিয়ে
ভাব্‌না আমার ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় চলে
পথ-হারানো দূর বিদেশে।
রাঙা ছিল সকালবেলার প্রথম রোদের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে যায় পাহাড় পেরিয়ে।
বেলা হল, ডাক পড়েছে ঘরে।
ওরা আমায় রাগ ক'রে কয়,
'দেরি করলি কেন ?'
চুপ করে সব শুনি।
ঘট ভরতে হয় না দেরি সবাই জানে,
উপচে-পড়া জলের কথা
বুঝবে না তো কেউ।

সাতাশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়
গ্রন্থপরিচয়ে ভিন্ন একটি পাঠ মুদ্রিত

প্রশ্ন

দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের ব্যাকুল চঞ্চলতা
দেহের দেহলীতে জাগায় দেহের-অতীত কথা।
খাঁচার পাখি যে বাণী কয়
সে তো কেবল খাঁচারই নয়,
তারি মধ্যে করুণ ভাষায় সুদূর অগোচর
বিস্মরণের ছায়ায় আনে অরণ্যমর্মর।

চোখের দেখা নয় তো কেবল দেখারই জাল বোনা,
কোন্ অলক্ষ্যে ছাড়িয়ে সে যায় সকল দেখাশোনা।
শীতের রৌদ্রে মাঠের শেষে
দেশ-হারানো কোন্ সে দেশে
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকে নিমেষ-হারা চোখে
দিগ্‌বলয়ের ইঙ্গিতলীন উধাও কল্পলোকে।

ভালোমন্দে বিকীর্ণ এই দীর্ঘ পথের বুকে
রাত্রদিনের যাত্রা চলে কত দুঃখে সুখে।
পথের লক্ষ্য পথ-চলাতেই
শেষ হবে কি ? আর কিছু নেই ?
দিগন্তে যার স্বর্ণ লিখন, সংগীতের আহ্বান,
নিরর্থকের গহ্বরে তার হঠাৎ অবসান ?

নানা ঋতুর ডাক পড়ে যেই মাটির গহন-তলে
চৈত্রতাপে, মাঘের হিমে, শ্রাবণ-বৃষ্টিজলে,
স্বপ্ন দেখে বীজ সেখানে
অভাবিতের গভীর টানে,
অন্ধকারে এই-যে ধেয়ান স্বপ্নে কি তার শেষ ?
উষার আলোয় ফুলের প্রকাশ, নাই কি সে উদ্দেশ ?

১৫ নভেম্বর ১৯৩৪

পঁয়ত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়

আমি

এই-যে সবার সামান্য পথ, পায়ে হাঁটার গলি,
সে পথ দিয়ে আমি চলি
সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে,
রাতের আঁধার দিনের জ্যোতিতে।
প্রতি তুচ্ছ মুহূর্তেরই আবর্জনা করি আমি জড়ো,
কারও চেয়ে নইকো আমি বড়ো।
চলতে পথে কখনো বা বিঁধছে কাঁটা পায়ে,
লাগছে ধুলো গায়ে;
দুর্বাসনার এলোমেলো হাওয়া,
তারি মধ্যে কতই চাওয়া পাওয়া,
কতই বা হারানো,
খেয়া ধরে ঘাটে আঘাটায়
নদী-পারানো।

এমনি করে দিন কেটেছে, হবে সে দিন সারা
বেয়ে সর্বসাধারণের ধারা।
শুধাও যদি সব-শেষে তার রইল কী ধন বাকি,
স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি তা কি!

জানি, এমন নাই কিছু যা পড়বে কারো চোখে,
স্মরণ-বিস্মরণের দোলায় দুলবে বিশ্বলোকে।
নয় সে মানিক, নয় সে সোনা—
যায় না তারে যাচাই করা, যায় না তারে গোনা।

এই দেখো-না— শীতের রোদে দিনের স্বপ্নে বোনা
সেগুন-বনে সবুজ-মেশা সোনা,
শজনে গাছে লাগল ফুলের রেশ,
হিমঝুরির হৈমন্তী পালা হয়েছে নিঃশেষ।
বেগ্‌নি-ছায়ার-ছোঁওয়া-লাগা স্তব্ধ বটের শাখা
ঘোর রহস্যে ঢাকা।
ফলসা গাছের ঝরা পাতা গাছের তলা জুড়ে
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে।
গোরুর গাড়ি মেঠো পথের তলে
উড়তি ধুলোয় দিকের আঁচল ধূসর ক'রে চলে।
নীরবতার বুকের মধ্যখানে
দূর অজানার বিধুর বাঁশি ভৈরবী সুর আনে।
কাজ-ভোলা এই দিন
নীল আকাশে পাখির মতো নিঃসীমে হয় লীন।
এরই মধ্যে আছি আমি,
সব হতে এই দামি।

কেননা আজ বুকের কাছে যায় যে জানা,
আরেকটি সেই দোসর আমি উড়িয়ে চলে বিরাট তাহার ডানা
জগতে জগতে
অন্তবিহীন ইতিহাসের পথে।

ওই-যে আমার কুয়োতলার কাছে
সামান্য ওই আমের গাছে
কখনো বা রৌদ্র খেলায় কভু শ্রাবণধারা,
সারা বরষ থাকে আপনহারা
সাধারণ এই অরণ্যানীর সবুজ আবরণে,
মাঘের শেষে যেন অকারণে
ক্ষণকালের গোপন মন্ত্রবলে
গভীর মাটির তলে
শিকড়ে তার শিহর লাগে—
শাখায় শাখায় হঠাৎ বাণী জাগে
'আছি আছি এই-যে আমি আছি'।
পুষ্পোচ্ছ্বাসে ধায় সে বাণী স্বর্গলোকের কাছাকাছি
দিকে দিগন্তরে।
চন্দ্র সূর্য তারার আলো তারে বরণ করে।

এমনি করেই মাঝে মাঝে সোনার কাঠি আনে
কভু প্রিয়ার মুগ্ধ চোখে কভু কবির গানে

অলস মনের শিয়রেতে কে সে অন্তর্যামী—
নিবিড় সত্যে জেগে ওঠে সামান্য এই আমি।

যে আমিরে ধূসর ছায়ায় প্রতিদিনের ভিড়ের মধ্যে দেখা
সেই আমিরে এক নিমেষের আলোয় দেখি একের মধ্যে একা।
সে-সব নিমেষ রয় কি না রয় কোনোখানে,
কেউ তাহাদের জানে বা না'ই জানে,
তবু তারা জীবনে মোর দেয় তো আনি
ক্ষণে ক্ষণে পরম বাণী
অনন্তকাল যাহা বাজে
বিশ্বচরাচরের মর্মমাঝে
'আছি আমি আছি'—
যে বাণীতে উঠে নাচি
মহাগগনসভাঙ্গনে আলোকঅপ্সরী
তারার মাল্য পরি।

১১।১ [১৯]৩৪

ছত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়

আষাঢ়

নব বরষার দিন,
বিশ্বলক্ষ্মী, তুমি আজ নবীন গৌরবে সমাসীন।
রিক্ত তপ্ত দিবসের নীরস প্রহরে
ধরণীর দৈন্য-'পরে
ছিলে তপস্যায় রত
রুদ্রের চরণতলে নত—
উপবাসশীর্ণ তনু, পিঙ্গল জটিল কেশপাশ,
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।
দুঃখেরে করিলে দগ্ধ দুঃখেরই দহনে
অহনে অহনে;
শুষ্কেরে জ্বালায়ে তীব্র অগ্নিশিখারূপে
ভস্ম করি দিলে তারে তোমার পূজার পুণ্যধূপে।
কালোরে করিলে আলো,
নিস্তেজেরে করিলে তেজালো;
নির্মম ত্যাগের হোমানলে
সম্ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হয়ে গেল পলে পলে।
অবশেষে দেখা দিল রুদ্রের উদার প্রসন্নতা,
বিপুল দাক্ষিণ্যে অবনতা
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর পানে।

নির্মল নবীন প্রাণে
অরণ্যানী
লভিল আপন বাণী।
দেবতার বর
মুহূর্তে আকাশ ঘিরি রচিল সজল মেঘস্তর।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
পেতে দিল আজি
শ্যাম আস্তরণ,
নেমে এল তার 'পরে সুন্দরের করুণ চরণ
সফল তপস্যা তব
জীর্ণতারে সমর্পিল রূপ অভিনব ;
মলিন দৈন্যের লজ্জা ঘুচাইয়া
নব ধারাজলে তারে স্নাত করি দিলে মুছাইয়া
কলঙ্কের গ্লানি ;
দীপ্ততেজে নৈরাশ্যেরে হানি
উদ্‌বেল উৎসাহে
রিক্ত যত নদীপথ ভরি দিলে অমৃতপ্রবাহে।
'জয় তব জয়'
গুরুগুরু মেঘগর্জে ভরিয়া উঠিল বিশ্বময়।

সাইত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়

যক্ষ

হে যক্ষ, তোমার প্রেম ছিল বদ্ধ কোরকের মতো
একান্তে প্রেয়সী তব সঙ্গে যবে ছিল অনিয়ত
সংকীর্ণ ঘরের কোণে, আপন বেষ্টনে তুমি যবে
রুদ্ধ রেখেছিলে তারে দুজনের নির্জন উৎসবে
সংসারের নিভৃত সীমায়, শ্রাবণের মেঘজাল
কৃপণের মতো যথা শশাঙ্কের রচে অন্তরাল—
আপনার আলিঙ্গনে আপনি হারায়ে ফেলে তারে—
সম্পূর্ণ মহিমা তার দেখিতে পায় না একেবারে
অন্ধ মোহাবেশে। বর তুমি পেলে যবে প্রভুশাপে
সামীপ্যের বন্ধ ছিন্ন হল, বিরহের দুঃখতাপে
প্রেম হল পূর্ণ বিকশিত; জানিল সে আপনারে
বিশ্বধরিত্রীর মাঝে। নির্বাধে তাহার চারি ধারে
সান্ধ্য অর্ঘ্য করে দান বৃষ্টিজলে-সিক্ত বনযূথী
গন্ধের অঞ্জলি; নীপনিকুঞ্জের জানালো আকূতি
রেণুভারে মন্থর পবন। উঠে গেল যবনিকা
আত্মবিস্মৃতির, দেখা দিল দিকে দিগন্তরে লিখা
উদার বর্ষার বাণী, যাত্রামন্ত্র বিশ্বপথিকের
মেঘধ্বজে আঁকা, দিগ্‌বধূপ্রাঙ্গণ হতে নির্ভীকের
শূন্যপথে অভিসার। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
দীক্ষা পেলে অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের; নিত্যরসে

আপনি করিলে সৃষ্টি রূপসীর অপূর্ব মুরতি
অন্তহীন গরিমায় কান্তিময়ী। এক দিন ছিল সেই সতী
গৃহের সঙ্গিনী, তারে বসাইলে ছন্দশঙ্খরবে
অলোক-আলোকদীপ্ত অলকার অমর গৌরবে
অনন্তের আনন্দমন্দিরে। প্রেম তব ছিল বাক্যহীন—
আজ সে পেয়েছে তার ভাষা, আজ তার রাত্রিদিন
সংগীততরঙ্গে আন্দোলিত। তুমি আজ হলে কবি,
মুক্ত তব দৃষ্টিপথে উদ্‌বারিত নিখিলের ছবি
শ্যামমেঘে স্নিগ্ধচ্ছায়া। বক্ষ ছাড়ি মর্মে অধ্যাসীনা
প্রিয়া তব ধ্যানোদ্ভবা লয়ে তার বিরহের বীণা।
অপরূপ রূপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
তোমার প্রেমের সৃষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বজনে।

দার্জিলিং
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

আটত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়

গ্রন্থপরিচয়

শেষ সপ্তক ১৩৪২ সালের ২৫ বৈশাখ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার রচনা সম্পর্কে এক চিঠিতে[১] কবি বলেন: 'প্রতিদিন একটা দুটো করে লিখে চলেছি তাই নিয়ে মন হয়ে আছে গুঞ্জরিত··· আজ কবিতার পালা শেষ করলুম।··· ২১ বৈশাখ ১৩৪২'

শেষ সপ্তকের ১৫-সংখ্যাঙ্কিত কবিতাবলীর সহিত শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত কবির দুইখানি পত্র তুলনীয়:

পথে ও পথের প্রান্তে ২৬ : শেষ সপ্তক ১৫।১

আমি আবার ঘর বদল করেছি। এই উদয়নের বাড়িতেই। বাড়িটার নাম উদয়ন, সে কথা জানিয়ে দেওয়া ভালো। উত্তরের দিকে দুটি ছোটো ঘর। এই রকম ছোটো ঘর আমি ভালোবাসি, তার কারণ তোমাকে বলি। ঘরটাই যদি বড়ো হয় তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়। বস্তুত বড়ো ঘরেই মানুষকে বেশি আবদ্ধ করে। তার মধ্যেই তার মনটা আসন ছড়িয়ে বসে, বাহিরটা বড্ড বেশি বাইরে সরে দাঁড়ায়। এই ছোটো ঘরে ঠিক আমার বাসের পক্ষে যতটুকু দরকার তার বেশি কিছুই নেই। সেখানে খাট আছে, টেবিল আছে, চৌকি আছে; সেই আসবাবের সঙ্গে একখণ্ড আকাশকে জড়িত ক'রে রেখে আকাশের শখ ঘরেই মেটাতে চাই নে। আকাশকে পেতে চাই তার স্বস্থানে বাইরে— পূর্ণভাবে, বিশুদ্ধভাবে। দেয়ালের ভিতরে যে আকাশকে বেঁধে রাখা হয় তাকে আমি ছেড়ে দেবামাত্রই সে আমার যথার্থ কাছে এসে দাঁড়ায়। একেবারেই আমার বসবার চৌকির অনতিদূরে, আমার জানলার গা ঘেঁষে। তার কাজ হচ্ছে মনকে ছুটি দেওয়া; সে যদি নিজে যথেষ্ট ছুটি না পায়, মনকে ছুটি দিতে পারে না। এইবার আমার ঘরে-আকাশে যথার্থ মিল হয়েছে— বেশ লাগছে। চেয়ে দেখি যতদূর দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই আমার ডেস্কের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে আনতে দেরি হয় না। জানলার কাছে বসে বসে প্রায়ই ভাবি, দূর ব'লে একটা পদার্থ আছে, সে বড়ো সুন্দর। বস্তুত সুন্দরের মধ্যে একটি দূরত্ব আছে, নিকট তার স্থূল হস্ত নিয়ে তাকে যেন নাগাল পায় না। সুন্দর

আমাদের সমস্ত দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়, তাই সে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও আমাদের প্রয়োজনের অতীত। আমাদের নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও এই 'দূর' পদার্থকে যদি না রাখতে পারি তা হলে আমাদের ছুটি নেই, তা হলে সমস্ত অসুন্দর হয়ে পড়ে। যারা বিষয়কর্মে অত্যন্ত নিবিষ্ট, তাদের জীবনে 'নিকট' আছে, 'দূর' নেই। কেননা স্বার্থ জিনিসটা মানুষের অত্যন্ত বেশি কাছের জিনিস, তার আসক্তি দেয়ালের মতো। আপন দেয়ালকে মানুষ ভালোবাসে— কেননা, 'দেয়াল আমারই, আর কারও নয়'। সেই ভালোবাসা যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন মানুষ ভুলে যায় যে, যা আমার অতীত তা কত আনন্দময় হতে পারে, তার প্রতি ভালোবাসার আর তুলনা হয় না।

কর্ম যখন বিষয়কর্ম না হয়, তখন সেই কর্ম মানুষকে দূরের স্বাদ দেয়, দূরের বাঁশি বাজায়। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি, তার মধ্যে প্রয়োজনের অতীত দূরের আকাশ আছে বলেই এত ভালোবাসি— তাতে এমন মগ্ন হতে পারি। সেইসঙ্গে আজকাল আমার বিদ্যালয়ের কাজ যোগ দিয়েছে— এরকম কাজে মনের মুক্তি। এ কাজের ক্ষেত্র নিকটের ক্ষেত্র নয়। দেশকালে বহুদূরবিস্তীর্ণ; অব্যবহিত নিজের কাছে থেকে কত দূরে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই; তাই এর জন্য ত্যাগ করা সহজ, এর জন্যে কাজ করতে ক্লান্তি নেই। সেইজন্য আজকাল আমি আমার মধ্যে যেন বহুদূরকে দেখি, আমি এখন আমার কাছে থাকি নে। আমার চোখের সামনে যেমন এই আকাশ, আমার চিন্তার মধ্যে সেই আকাশ, আমার চেষ্টা উড়ে চলেছে সেই আকাশে। এই রকমের কাজে অনেকে জড়িত হয়ে থাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা পাবার জন্যে; এমন উদার কাজও তাদের পক্ষে বন্ধন, মুক্তির ক্ষেত্রেও তারা interned। আমার কাজে আমি ক্ষমতা চাই নে, আমার নিজের দিকের কিছুই চাই নে, কাজের মধ্যে আমি বিরাট বাহিরকে চাই, দূরকে চাই— 'আমি সুদূরের পিয়াসী'। বস্তুত বাহির থেকে দেখলে আজকাল আমার লেশমাত্র সময় নেই, কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে প্রত্যেক মুহূর্তই আমার অবকাশ। নিজের দিকে

কোনো ফল পাব এ কথা যখনি তুলি তখনি দেখতে পাই কর্মের মতো ছুটি আর নেই। কর্মহীন শুধু ছুটিতে মুক্তি পাই নে, কেননা সে ছুটিও নিজেকে নিয়েই। ইতি ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

পথে ও পথের প্রান্তে ২৭ : শেষ সপ্তক ১৫।২-৩

অন্য কথা পরে হবে, গোড়াতেই বলে রাখি তুমি যে চা পাঠিয়েছিলে সেটা খুব ভালো। এতদিন যে লিখি নি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ববশত। যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা। একটা যা হয় কিছু মাথায় আসে সেটা লিখে ফেলি, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ছোটো বড়ো যে-সব খবর জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার ছবিও ঐ রকম। যা হয় কোনো-একটা রূপ মনের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, চার দিকের কোনো কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক্‌ বা না থাক্‌। আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙাগড়া চলাফেরা জোড়াতাড়া চলছেই, কিছু বা ভাব কিছু বা ছবি নানারকম চেহারা ধরছে— তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার। এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে— রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই— স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়— রূপের সমাবেশ। আশ্চর্য এই-যে তাতে গভীর আনন্দ। ভারী নেশা। আজকাল রেখায় আমাকে পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছি নে। কেবলই তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পরে তাঁর মনের কথা জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করছেন— আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অন্তহীন। আর কিছু নয়, সুনির্দিষ্টতাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা।

অমিতা যখন সুমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে যে আনন্দ সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ। যেখায় সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি, মন বলে ওঠে 'নিশ্চিত দেখতে পেলুম'— তা সে যাকেই দেখি না কেন, এক-টুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটাগাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক। নিশ্চিত দেখতে পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি। তাই ব'লে এ কথা ভুললে চলবে না যে, তোমার চা খুব ভালো লেগেছে। ইতি
১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

শেষ সপ্তকের তেইশ ও চৌত্রিশ -সংখ্যক কবিতার সহিত প্রান্তিক (১৩৪৪) গ্রন্থের পনেরো ও ষোলো -সংখ্যক কবিতা তুলনীয়। ছন্দোবদ্ধ ঐ দুটি কবিতার রচনা যথাক্রমে ১৩।৯।১৯৩৪ [২৭ ভাদ্র ১৩৪১] ও ৭ বৈশাখ ১৩৪১ তারিখে, ফলতঃ শেষ সপ্তক -ধৃত কবিতার পূর্বেই মনে হয়। শেষ সপ্তকের সাতাশ-সংখ্যক কবিতার ছন্দোবদ্ধ পূর্বতন একটি রূপ 'সংযোজন' অংশে (ঘট ভরা, পৃ ১৯৩) মুদ্রিত। এ স্থলে পাণ্ডুলিপি -ধৃত অন্য একটি পাঠ সংকলিত হইল—

আমার এই ছোটো কলস পেতে রাখি
ঝরনাধারার নীচে।
সকালবেলায় বসে থাকি
শেওলা-ঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।
ঘট ভরে যায় এক নিমেষে,
ফেনিয়ে ওঠে ছল্‌ছলিয়ে,
ছাপিয়ে পড়ে বারে বারে,
সেই খেলা ওর আমার মনের খেলা।

সবুজ দিয়ে মিনে-করা
পাহাড়তলির নীল আকাশে
ঝর্‌ঝরানি উছলে ওঠে দিনে রাতে।

ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার
গাঁয়ের মেয়েরা।

জলের ধ্বনি যায় পেরিয়ে
বেগ্‌নি রঙের বনের সীমানা
যেখানে ঐ বুনো পাড়ার হাটের মানুষ
ওরাই গ্রামের রাস্তা ছেড়ে
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াই পথে,
বলদের পিঠে বোঝাই
শুক্‌নো কাঠের আঁঠি ;
ঝুমুঝুমু ঘণ্টা গলায় বাঁধা।

প্রথম প্রহর গেল কেটে।
রাঙা ছিল সকালবেলার নতুন রোদের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে যায় পেরিয়ে পাহাড়
জলার দিকে।

বেলা হল, ডাক পড়েছে ঘরে।
ওরা আমায় রাগ করে কয়,
'দেরি করলি কেন ?'
চুপ ক'রে সব শুনি।
ঘট ভরতে হয় না দেরি, সবাই জানে—
উপচে-পড়া জলের কথা
বুঝবে না তো ওরা।

চারুচন্দ্র দত্তের উদ্দেশে লিখিত বিয়াল্লিশ-সংখ্যক কবিতার প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৫৯ আষাঢ় সংখ্যায় (পৃ ২৩৬) মুদ্রিত হয় : "এই কবিতাটি ছাপাখানার কৃপায় খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভুল রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে সংশোধন করিয়া পাঠান।" চারুচন্দ্র দত্তের পুত্র অরিন্দম দত্তের নিকট হইতে শ্রীঅমলকুমার বসুর সৌজন্যে সংকলিত এই অংশের পাণ্ডুলিপি কিছুকাল পূর্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক, এইরূপ অনুমিত হয়।

কিন্তু শেষ সপ্তকের যে-দুইটি পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদনে আছে তাহার একটি রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে, অপরটি রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংযোজন ও সংশোধন -সংবলিত অন্যের লেখা প্রেস-কপি যেটি হুবহু শেষ সপ্তক গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে— পাণ্ডুলিপি-দুইটির কোনোটিতেই উল্লিখিত অংশটি নাই। সম্পূর্ণ কবিতাটির পাণ্ডুলিপি চারুচন্দ্র দত্তের সংগ্রহ হইতে না পাওয়ায় বা না দেখায়, ঐ অংশটি রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র দত্তকে প্রদত্ত পাণ্ডুলিপিতে পরে বসাইয়া দিয়াছিলেন কি না নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। চারুচন্দ্র দত্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে-সকল চিঠিপত্র রবীন্দ্রসদনে আছে তাহাতেও এ প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখ নাই।

যথালব্ধ খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির পাঠ এখানে মুদ্রিত হইল :

কতবার মনে ভেবেছি
তোমার মন যেন সুবর্ণরেখা নদী।
তলায় সঞ্চিত নানা আকারের পাথর,
নানা রঙের নুড়ি—
তারা সারবান, তারা ভারবান।
বালির সঙ্গে লুকিয়ে আছে
সোনার কণা,
তারা মূল্যবান।
তাদের উপর দিয়ে বহে চলে যায়
কলমুখর ধারা

চপল ভঙ্গীতে,
ধরণীর প্রাণের স্রোতের সঙ্গে মেলে
তার ছন্দের গতি,
সকালে বিকালে তার তরঙ্গে নাচে
লোকালয়ের ছায়া—
এই তোমার স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল
গল্পের প্রবাহ।

সংযোজন -ধৃত 'আমি' (পৃ ১৯৭) কবিতার একটি খসড়া রূপ অংশতঃ সংকলন করেন শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার কোনো পুরাতন পত্রে। তদনুযায়ী প্রথমাংশে অবিচ্ছেদে পাওয়া যায়, মুদ্রিত কবিতার প্রথম স্তবকের ছত্র ১-৬, দ্বিতীয়ের ছত্র ১-৪ এবং তৃতীয়ের ছত্র ১-৪ ; শেষাংশে :

দোসর-আমি ছড়িয়ে আছে
বিশ্ব-জোড়া পক্ষিমাতার ডানা।
যে আমিরে ধূসর-ছায়া
প্রতিদিনের ভিড়ের মধ্যে দেখা
সেই আমিরে এক নিমেষের আলোয় দেখি
একের মধ্যে একা।

দেখা যাইবে— 'দোসর-আমি ··· ডানা' পূর্বমুদ্রিত তৃতীয় স্তবকের শেষ বাক্যে একটি ছত্রাংশ এবং অবশিষ্ট সংকলন মুদ্রিত শেষ স্তবকেরই সূচনার দুই ছত্র বা একটি বাক্য।

শেষ সপ্তক কাব্য (মূল গ্রন্থ / এক-ছেচল্লিশ) অতি অল্প সময়ে রচনা করা হয়, তাহার আভাস পাওয়া যায় শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে। এজন্যই সাময়িক পত্রে প্রচারের সুযোগ এমন-কি ইচ্ছাও হয়তো ছিল না। এ ব্যাপারে বোধ করি প্রথম কবিতাটিই বিশেষ ব্যতিক্রম ;

কেননা, ১৩৩৯ অগ্রহায়ণে লেখার পর ঐ বৎসরেই 'রূপ-রেখা' সাময়িক পত্রে মুদ্রিত। এই পূর্বতন মুদ্রিত পাঠে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে নানা পরিবর্তন করেন শেষ সপ্তক কাব্যে সংকলনের পূর্বে তাহা সংরক্ষিত প্রেস-কপিতেই দেখা যায়। গ্রন্থে ছাপা হওয়ার পূর্বে কবি প্রুফে আরও পরিবর্তন অবশ্যই করিয়া থাকিবেন, তাহাও জানা যায় গ্রন্থ-ধৃত বহুপরিচিত পাঠ হইতে।

এ স্থলে 'মূল' বা 'মূলের কাছাকাছি' সাময়িক পত্রের পাঠ যেমন সংকলন করা গেল, প্রেস-কপিতে কবির স্বহস্তের পরিবর্তন জ্ঞাপন করা হইল ছত্রসংখ্যার সাহায্যে। কৌতূহলী পাঠক উভয়ই গ্রন্থমুদ্রিত সর্বশেষ পাঠের সহিত মিলাইলে লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই; রচনার প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করা বা বিচার-বিশ্লেষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে আশা করা যায়।

মূল্যশোধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাকে পেয়েছি বলে জেনেছিলেম,
কোনো দাম করোনি দাবী।
দিন গেছে রাত গেছে,
দিয়েছ ডালি তোমার উজাড় করে।
একবার আড়চোখে চেয়ে
ভাণ্ডার ভরেছি অনায়াসে আনমনে।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে পূর্ণ করে,
যাচাই করিনি
আপন গর্বে ছিলেম উদাসীন॥

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে
"তুমি আমার রাজা,
তোমাকে যা দিই—
তোমার রাজকর যে তার চেয়ে অনেক বেশি,
আরো দেওয়া হোলোনা
কেননা, আরো যে আমার নেই।"
বল্‌তে বল্‌তে তোমার দুই চোখ দিয়ে জল পড়েছিল ॥

আজ তুমি গেছ চলে,
আর ফিরবে না কোনো দিন।

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখ্‌ছি তোমার রত্নমালা।
নিয়েছি মাথায় তুলে, নিয়েছি বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।

প্রাণ ভরে উঠল বেদনায়
ঢেলে দিলেম তোমার উদ্দেশে।
এতদিনে তোমার দাম দেওয়া হোলো
পেলেম তাই পূর্ণ করে ॥

শান্তিনিকেতন
১ অগ্রহায়ণ
১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থপ্রকাশকালে উৎকলিত সাময়িক পত্রের পাঠে রবীন্দ্রনাথ-কৃত যে-সকল পরিবর্তন ও সংযোজন, কবিতায় আরোপিত ছত্র-সংখ্যা অনুসারে সংকলন করা যাইতেছে। ছত্র ১~ ২ বলিতে পূর্বতন ছত্র ১ ও ২'এর অন্তর্বর্তী নূতন ছত্র। এরূপ সর্বত্র।

১ : স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে।

নূতন ছত্র, ১~ ২ : তাই যাচাই করি নি।

৩ : দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,

৪ : দিলে ডালি উজাড় করে।

৫ : আড়চোখে চেয়ে

৬ : আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে।

নূতন ছত্র ৬~ ৭ : পরদিনে গেলেম ভুলে।

৯ ছত্র-শেষে কমা'র স্থলে পূর্ণচ্ছেদ

১০-১১ বর্জিত

১৪ বর্জিত

১৫ সূচনায় উদ্ধৃতি-চিহ্ন

১৬ 'যে' বর্জিত ; ছত্রশেষে কমার স্থলে সেমিকোলন

১৮ 'কেননা' বর্জিত

১৯ : বল্‌তে বল্‌তে তোমার চোখ এলো ছল্‌ছলিয়ে॥

২১ : দিনের পর দিন রাতের পর রাত আসে।

নূতন ছত্র ২১~ ২২ : তুমি আর আসোনা।

২৩ ছত্র-শেষে পূর্ণচ্ছেদের স্থলে কমা ও ড্যাশ

২৪ : নিয়েছি তুলে বুকে।

২৮-২৯ বর্জিত

৩০ : তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হোলো বেদনায়,

৩১ : হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে॥

স্বাক্ষর-সহ শিরোনাম অপিচ কবিতা-শেষে স্থান-কাল-জ্ঞাপক তিনটি ছত্র ও স্বাক্ষর শেষ সপ্তক সংকলনে স্বতই বর্জিত।

'দুঃখজাল' (পৃ ১৮৫) কবিতাটি রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। মাস অব্দ ও পৃষ্ঠাঙ্ক-সহ সংযোজন-ধৃত অন্যান্য কবিতাবলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের তালিকা পরে দেওয়া গেল—

স্বস্তিপাথেয়। প্রবাসী : শ্রাবণ ১৩৪০। ৫০২
বাতাবির চারা। বিচিত্রা : ফাল্গুন ১৩৪০। ১৩৭
শেষ পর্ব। প্রবাসী : কার্তিক ১৩৪১। ১
মর্মবাণী। পরিচয় : বৈশাখ ১৩৪১। ৫৭৬
ঘট ভরা। প্রবাসী : অগ্রহায়ণ ১৩৪৩। ১৭৭
প্রশ্ন। প্রবাসী : মাঘ ১৩৪১। ৪৬১
আমি। প্রবাসী : ফাল্গুন ১৩৪০। ৫৯৩
আষাঢ়। প্রবাসী : আষাঢ় ১৩৪০। ৩০৫
যক্ষ। প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৪১। ৭৬৯

উত্তর টীকা ১

বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ে প্রথম অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য, পৃ ২০৭। উক্ত উদ্ধৃতি শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা কবির এক চিঠি হইতে। উহা চিঠিপত্র-১১ (আষাঢ় ১৩৮১)-ধৃত, পৃ ১৫৮-১৫৯। ফলে ইহাও স্পষ্ট হয়, শেষ সপ্তকের অতি অল্প কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রকাশের সময় বা সুযোগ ছিল, রচনার সুনির্দিষ্ট তারিখও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তথাপি অল্প যাহা সাময়িক পত্রে প্রচারিত, যে রচনায় বিশেষ তারিখ পাওয়া যায়, প্রয়োজনীয়

তথ্য হিসাবে এ স্থলে তাহা সংকলন করা গেল। সংযোজন অংশের কয়েকটি কবিতার রচনাকালও রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

কবিতা-সংখ্যা শিরোনাম প্রচার

এক / 'মূল্যশোধ'। রূপ-রেখা : ১৩৩৯, ১ম বর্ষ। পৃ ১

নয় / 'অসমাপ্ত'। প্রবাসী : বৈশাখ ১৩৪২। পৃ ১

দশ / রচনা : শান্তিনিকেতন। ৪।৪।৩৫ বা ২১ চৈত্র ১৩৪১

'অতীতবাণী'। বিচিত্রা : বৈশাখ ১৩৪২। পৃ ৪২১

ষোলো ১ ও ২ / রচনা : ৭।৪।১৯৩৫ বা ২৪ চৈত্র ১৩৪১

তেত্রিশ / 'শিখ'। প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২। পৃ ১৫৩

সংযোজন

বাতাবির চারা / রচনা : ১৪।১।৩৪ বা ৩০ পৌষ ১৩৪০

মর্মবাণী / রচনা : ১৩।১।৩৪ বা ২৯ পৌষ ১৩৪০

ঘট ভরা। সংযোজন -ধৃত পাঠ প্রবাসী পত্রে মুদ্রণকালে সূচনায় বলা হয় : "শেষ সপ্তক" সাতাশ-সংখ্যক যে কবিতাটি ছন্দোহীন গদ্যে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথমে সেটা মিলহীন পদ্যছন্দে লেখা হয়েছিল।

আমি / রচনা : ১১।১।৩৪ বা ২৭ পৌষ ১৩৪০

সংযোজন ও গ্রন্থপরিচয় -সংকলন : কানাই সামন্ত